অশরীরী আতঙ্ক

অনীশ দাস অপু



অশরীরী আতঙ্ক

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

ভূমিকা

'নরসিংহপুরের পিশাচ'-এর মুখবন্ধে লিখেছিলাম বইটির একটি গল্প পড়েও যদি তৃপ্তি পান পাঠক, সফল হবে আমার পরিশ্রম, ভবিষ্যতে সেবা ও রহস্যপত্রিকার লেখকদের লেখা পিশাচ কাহিনী নিয়ে একটি সংকলন উপহার দিতে উৎসাহ পাব।

'নরসিংহপুরের পিশাচ' প্রকাশিত হওয়ার পরে বেশ কিছু পাঠকের চিঠি আমি পেয়েছি, যাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বইটির। কেউ ফোন করেছেন (সিলেটের নাফে মোহাম্মদ এনাম) কেউবা মুখোমুখি ব্যক্ত করেছেন বইটির ব্যাপারে তাঁর ভাল লাগার কথা (সিলেট বাজার-এর সাংবাদিক মিজানুর রহমান মিজান)। শাকিল (ঠিকানা দেননি) নামে একজন লিখেছেন, 'দুর্দান্ত এক সংকলন এটি...আপনি কথা দিয়েছেন "নরসিংহপুরের পিশাচ"-এর পর আরেকটি সংকলন তৈরি করবেন। অপেক্ষায় রইলাম।'

পাঠকের উৎসাহই আমার অনুপ্রেরণা। তাই প্রচুর খাটাখাটনির পরে তৈরি হলো এবারের সংকলন—'অশরীরী আতঙ্ক'। বইটিতে চমৎকার কিছু পিশাচ কাহিনী স্থান পেয়েছে, কোনও কোনওটি আক্ষরিক অর্থেই গা শিউরানো। আশা করি, পাঠক উপভোগ করবেন গল্পগুলো। বলাবাহুল্য, এবারও গল্প নির্বাচনে পুরো স্বাধীনতা ছিল আমার। এজন্য কাজী শাহনূর হোসেনকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই মানুষটি শুধু ভাল হরর গল্প লেখেনই না, গল্প বোঝেনও ভাল। বইটির গল্প বাছাই করতে গিয়ে লক্ষ করেছি আমার পছন্দের বেশীরভাগ কাহিনীর সঙ্গে তাঁর রুচি আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেছে। অশরীরী আতঙ্ক'র কিছু গল্প বাছাইয়ে তিনি যে সুচিন্তিত মন্তব্য দিয়েছেন, তাতে বইটি আরও মানসম্পন্ন হয়ে উঠেছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার ধারণা, কাজী শাহনূর হোসেন কখনও হরর কিংবা পিশাচ গল্প সংকলন তৈরীতে হাত দিলে পাঠক তাঁর কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর বই উপহার পাবেন।

অনেক পাঠক চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন আমি কেন হরর ও পিশাচ কাহিনীভিত্তিক গল্প সংকলন আরও বেশী বেশী বের করছি না, এ ধরনের উপন্যাস রচনাতেই বা কেন অনিয়মিত? গল্প সংকলন সম্পাদনা বেশ দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ কাজ। তবু পাঠকের দাবি সবকিছুর উর্ধ্বে। পাঠক চাইলে ভবিষ্যতে আরও হরর ও পিশাচ কাহিনী ভিত্তিক গল্প সংকলন হয়তো উপহার দেওয়া সম্ভব হবে।...আর উপন্যাস? নানা কারণে এ অঙ্গনে এতদিন নিয়মিত হতে পারিনি। এবার থেকে হব। আগামী বইমেলায় সম্ভবত আপনাদের সামনে শ্বাসরুদ্ধকর পিশাচ উপন্যাস 'ভয়াল রাত' নিয়ে হাজির হচ্ছি। আশা করি, এরপর থেকে নিয়মিত পিশাচ ও হরর কাহিনী উপহার পেতে থাকবেন, পাঠক। সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

অনীশ দাস অপু

২৬৩, জাফরাবাদ, শঙ্কর, ঢাকা।

নিশিডাক

'আর কতদূর?'

'এই তো.' বলেই লোকটা পথ দেখিয়ে আমার সামনে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল।

রাত গভীর। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। গ্রামের নিশুতি রাত চোখে যে না দেখেছে তার পক্ষে বোঝা মুশকিল এই বর্ণনা। তার ওপর সন্ধ্যে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। পায়ে চলার রাস্তাটুকু কাদায় পানিতে একাকার। আমার পায়ে গামবুট। বাঁ হাতে ডাক্তারি ব্যাগ। ডান হাতে ছোট একটা ছাতা. সেটা খুলে মাথায় দিয়ে চলেছি। বলতে গেলে এলাকায় আমি নতুন। ডাক্তার হিসেবেও নতুন। সবে গেল বছর পাশ করেছি। সরকারি চাকুরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এই ছোট গ্রামটার হেলথ কমপ্লেক্স-এ মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে আমাকে পোস্টিং দিয়েছে। ইন্টারনী-শিপ করার বিদ্যেটুকুই মাত্র ডাক্তারি ঝুলিতে ভরে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি। জানিনে. এখানকার লোকে আমার জ্ঞানের বহর সম্পর্কে কতটুকু খোঁজ রাখে. তবে সম্মান করে বেশ। তাতেই নিজের প্রতি আস্থা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মাত্র চার মাস হলো এখানে এসেছি। এখনও সবার সাথে ভাল করে পরিচয় হয়নি। তবে পরিচয় যে একদিন হবে তাতে সন্দেহ নেই। লোকে বলে একবার এসব জায়গায় পোস্টিং হলে হেলথ সার্ভিসের ওপরওয়ালারা নাকি ডাক্তারদের নাম-ধামও ভুলে যায়, ফাইল হারিয়ে ফেলে. যাতে করে সে এখান থেকে একযুগের আগে নড়তে না পারে। তবে যার ধরাধরি করার লোক আছে, তার কথা আলাদা। তা সে যাক। সে সব পরে দেখা যাবে। এখন এই মুশকিল আসান হলে বাঁচি।

আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিনে বিশেষ। তবু মানুষের আপদবিপদ হলে তরুণ মন এখনও সাড়া দেয়। মাঝে মাঝে গ্রামের ভেতর থেকে ডাক পড়ে। পেট ব্যথা, বমি, হঠাৎ জ্বর. প্রসব ব্যথা, ফিট. ডায়রিয়া ইত্যাদি খবর নিয়ে লোকে রাত বিরেতে সাহায্য চাইতে এলে আমার শুভার্থীদের মানাটানা করা সত্ত্বেও না গিয়ে পারিনে। আমার ডাক্তারি ব্যাগে ইনজেকশন. স্যালাইন ব্যাগ আর অ্যান্টি ডায়রিয়া, অ্যান্টি বমি, ও অ্যান্টি ব্যথার কিছু বড়ি সব সময় রাখা থাকে। আর থাকে স্টেথোসকোপ, থার্মোমিটার, হ্যামার. প্রেসার মাপার যন্ত্র, সুঁই সুতো, ছোট কাঁচি, স্ক্যালপেল. ছোট আর্টারি ফোরসেপ, নিডিল হোলডার. কিছু গজ, ব্যান্ডেজ. তুলো এইসব। টাকা কড়ি অল্পই থাকে সঙ্গে। থাকে না বললেই চলে।

'আর কত দূর?'

'এই তো,' বলেই লোকটা আবার দ্রুত বেগে চলতে লাগল।

মনের হারিজাবি চিন্তায় এতক্ষণ খেয়াল করিনি যে গ্রামের প্রায় অন্য সীমানায় চলে এসেছি। চারপাশে ঝরঝর করে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। শিয়াল কুকুরের ডাকও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশ এত অন্ধকার যে মনে হয় যেন কালো ছাতার মত গোল হয়ে আমাদের চারপাশে চেপে বসেছে। আমার গা মাথা ভিজে এসেছে। পায়ে গামবুট থাকার জন্যে তাও কিছুটা রক্ষা। এইটে আমি বুদ্ধি করে ঢাকা ছেড়ে আসার সময় কিনে এনেছি। এখন বেশ কাজ দিচ্ছে। এই বৃষ্টি আজ চারদিন। বাংলাদেশের বর্ষা যে কী, তা এ সব গ্রামে না এলে বোঝা যায় না। সমস্ত গ্রাম্যজীবন যেন নিথর হয়ে পড়ে থাকে। এদিকে আমার সামনের হন্ হন্ করে হেঁটে যাওয়া লোকটাকে আমি চিনিনে। সে কোথায় থাকে জানিনে। তবে তার চলাফেরা এই বৃষ্টির ভেতরেও এত সাবলীল যে, সে যে এই গ্রামেরই লোক তাতে সন্দেহ নেই। অন্ধকারে তার চাদরের সাদা প্রান্তটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই অনুসরণ করে চলেছি। এই সময় খেয়াল করে দেখি লোকটা যেন শুধু চাদর পরেই আমাকে ডাকতে এসেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা, চাদরের এক প্রান্ত উড়নির মত আমার সামনে ঝুলে আছে যা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, বাকিটুকু আমার চোখের আড়ালে, তবে বুঝতে পারছি তার অস্তিত্ব। লোকটার হাতে ছাতা নেই, অতএব অনুমান করা যায়, সে ভিজতে ভিজতেই চলেছে।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল, লোকটার নাম কী? সে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে শুধু বলেছে, 'আমার মেয়ের বড় বিপদ, দয়া করে একটু দেখে যান ডাক্তার সাহেব।' লোকটার গলার স্বরে কী ছিল জানিনে, আমি সম্মত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। সাধারণত এ রকম রাতের ডাকে আমার সহকারী নুরল ইসলাম সঙ্গে থাকে। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে আজ তিন দিন সে কাজে আসতে পারছে না। মানুষের বিপদআপদ তো বৃষ্টির জন্যে বসে থাকবে না, আমিও সে কথা ভেবে ঘুমের ঘোর কাটতে না কাটতেই মেশিনের মত আমার ডাক্তারি ব্যাগ আর ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়েছি।

আমি থাকি হেলথ কমপ্লেক্স-এরই ওপরের তলার একটা রুমে। সকলেই সে কথা জানে। লোকটার তাই মোটেও আমাদের ঘরের সামনে গিয়ে আমাকে ডাকতে অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু লোকটা কে? কার সঙ্গে আমি চলেছি? কোথায় চলেছি? আশ্চর্য, এই সব প্রশ্ন আগে আমার মাথায় আসেনি, কিন্তু এখন আসছে। কারণ এখন আমার চোখে আর ঘুমের ঘোর নেই। চলতে চলতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলাম, 'আপনি কে? আপনার নাম কী? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

'এই তো এসে গেছি,' বলে লোকটা আমার কথার সোজা জবাব না দিয়ে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে বিরাট এক বাঁশঝাড়। বাঁশবাগান বলা যেতে পারে। আর তার ভেতর দিয়ে সরু পায়ে চলার

পথ। সেখানে পা ফেলতেই ইঞ্চি চারেক বুটসুদ্ধ পা আমার বসে গেল মাটিতে। অনেক কষ্টে পা তুলে পথ চলতে লাগলাম। ছাতাটা বন্ধ করে নিয়েছিলাম আগেই, পকেটে ছোট একটা পেনসিল টর্চ ছিল, সেটা জ্বালিয়ে দেখি বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে পায়ে চলার এ পথ বেশ কিছুদূর চলে গেছে। লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে বোঝা যাচ্ছে ডাক্তারকে বাড়ির কাছ পর্যন্ত এনে সে তড়িঘড়ি করে রোগীর কাছেই উপস্থিত হয়েছে। আমি ইতস্তত করতে করতে বাঁশের পাতা, থকথকে পুরু কাদার স্তর, পানি, মাটিতে পড়ে থাকা পচা বাঁশ, গরুর গোবর ইত্যাদি বুট পরা পায়ে খপ খপ করে ডিঙিয়ে পথ পার হতে লাগলাম। আমি লম্বা বলে মাথা নিচু করে আমাকে পথ চলতে হচ্ছিল, নতুবা কঞ্চির খোঁচায় চুল আটকে যাচ্ছিল। আর, একবার আটকে গেলে সে এক সমস্যা। মোটকথা ওই দারুণ আবহাওয়ার ভেতরে, রাতের ভেতর, বৃষ্টির একঘেয়ে নিস্তব্ধতার ভেতরে আমাকে সব কিছু সামলে হিসেব করে চলতে হচ্ছিল। আমার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল পথের দিকে। এমন সময় আমার কোটের আস্তিন ধরে আচমকা পিছন থেকে টেনে ধরল কেউ, ভয়ে আমার গলা চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে পড়ল। ঠিক তখুনি মাথার ওপরে ডানা ঝাপটে চিৎকার করে উঠল একটা পাখি, যে পাখির ডাক আমি আগে কখনও শুনিনি। বিদ্যুৎ বেগে পিছনে তাকিয়ে দেখি একটা পাতাবিহীন সবুজ বাঁশের কঞ্চি আমার কোটের আস্তিন টেনে ধরেছে। এত জোর সেই টানে যে আস্তিনের একটা দিক তেকোনা হয়ে ছিঁড়ে বাতাসে ঝুলছে। মনটা দমে গেল। মাত্র সেদিন অনেক টাকা গুনোগার দিয়ে এই কোটটা দর্জিকে দিয়ে করিয়েছি। ভয়ও ঢুকল মনে। অজানা অচেনা এক ভয়। এবং এই প্রথম আমার মনে হলো, ফিরে যাই।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরে একটা অহং বলে পদার্থ আছে। তাকে খোলা চোখে দেখা যায় না, তবে তার শক্তি প্রচণ্ড। তার কাছে মানুষ নত হতে কিছুতেই চায় না। তাই আমি কল্পনা করি, আমার মত এরকম পরিস্থিতিতে এর আগে যারাই পড়েছে, তারা জানে, ফিরে আর যাওয়া যায় না। এতদূর এসে আর ফিরতে পারে না কেউ। অতএব একবার মনে মনে ফিরে যাবার কথা ভাবলেও সেটাকে কাপুরুষতা ভেবে তুরি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আমি অগ্রসর হলাম। এবং একটু পরেই এসে হাজির হলাম একটা কোঠাবাড়ির সামনে।

কোঠাবাড়িটাকে দেখে আমার মনে স্বস্তি ফিরে এল। যাক এতক্ষণ বাদে অন্তত বোঝা গেল আমার লক্ষ্যস্থল কী। বাড়িটা পুরনো। বৃষ্টি ও অন্ধকারের ভেতরে বিশেষ বোঝা না গেলেও এটা যে বেশ বড়সড় বাড়ি সে বিষয়ে সন্দেহ থাকল না মনে। বাড়িটার জানালা দরজা সব বন্ধ মনে হলো। কারণ বাইরে থেকে কোন আলোর নিশানা পাওয়া গেল না। অবশ্য এ রকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্ধ থাকাটাই স্বাভাবিক।

*

আমি বাড়ির সদর মনে করে যেখানে দাঁড়ালাম, তার সামনে চাতাল। চাতাল ডিঙিয়ে ঘর। ঘরের সামনে দরজা। কাছে গিয়ে ঠেলা দিতেই ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নাকে পুরনো পচা একটা গন্ধ এসে ধাক্কা দিল। গন্ধটা আমার অচেনা নয়, তবে কোথায় যে এর আগে পেয়েছি মনে করতে পারলাম না। এরকম একটা গন্ধ কোন ভদ্র বাড়িতে আশা করা যায় না। তবে যে বাড়িতে গুরুতর অসুস্থ রোগী আছে এবং যেখানে আজ চারদিন ধরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে সেখানে এরকম বিদঘুটে গন্ধের কারণ হয়তো কিছুটা অনুমান করা যায়।

বাড়ির ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা আবার বের করে ঘরের মেঝেয় ফোকাস করে খানিক এবড়োখেবড়ো সিমেন্টের মেঝে ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। অচেনা বাড়িতে এভাবে ঢুকে পড়া কি ঠিক হবে? আমি ইতস্তত করে হাতের ব্যাগ মাটিতে রেখে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে তাই হাঁক দিলাম, 'আপনি কোথায়?'

আমার মনে হলো, হয়তো শোনার ভুলও হতে পারে, আমার এই হাঁকে ঘরের ভেতরে যেন নিঃশব্দে একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। অনেকগুলো পায়ের ত্রস্ত শব্দ, যেন দ্রুতবেগে হুড়োহুড়ি করে কারা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভাবলাম, হয়তো বাড়ির মহিলারা হবে। গ্রামদেশের মহিলারা এমনিতেই একটু নিঃশব্দে চলাফেরা করে, তার ওপর বাড়িতে খারাপ রোগী থাকলে মানুষ একটু চুপ হয়ে যায়। কিন্তু বাড়িতে আলো নেই কেন? এ কথা ভেবে আমার বিস্ময় বোধ হয়। যদিও জানি গ্রামের অনেক মানুষ তেল খরচ হওয়ার ভয়ে রাতে ঘরে বাতি জ্বালায় না, অন্ধকার হওয়ার আগেই সব কাজ সেরে নেয়, এমন কী রাতে খাওয়াদাওয়া ও টয়লেট পর্যন্ত। গ্রামের মানুষ যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কতখানি পঙ্গু হয়ে আছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না। তবু এই পরিস্থিতিতে আলো না থাকাটা যেন কোন রকমেই ক্ষমা করা যায় না। আমি একবার বেশ বিরক্ত হলাম লোকটার ওপর তো বটেই, নিজের ওপরেও। আবার একবার গলা ছেড়ে হাঁক দেবার আগেই মনে হলো আমার কাঁধে কে যেন একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা রেখে নিচু, খসখসে গলায় বলল, 'ভেতরে আসেন।'

আমি চমকে গিয়ে আমার ডাক্তারি ব্যাগের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। সামলে পাশ ফিরে দেখি কখন সেই চাদর মোড়া লোকটা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, 'আপনার গায়ে দেখি অসম্ভব জ্বর। আপনি হাত দিয়ে আমাকে ছোঁয়া মাত্র আমার শরীর মনে হল যেন পুড়ে গেল। এত জ্বর গায়ে নিয়ে আপনি আমাকে ডাকতে গেছেন এই বৃষ্টির ভেতরে? নিউমোনিয়া হয়ে দেখি মারা পড়বেন আপনি।'

আমার কথা যেন লোকটা গায়েই মাখল না। বরং মাথা নিচু করে এমন ভাবে হাসল যে শুনে আমার গা শির্‌ শির করতে লাগল। খসখসে গলার হাসি যে এমন শোনায় আমার ধারণা ছিল না। সে আমার আগে আগে সেই ঘরের

ভেতরে ঢুকল। আমি অনুসরণ করলাম তাকে। আবার টর্চটা জ্বালাবার চেষ্টা করলাম। রোগী পরীক্ষার টর্চ। আমার বড় টর্চটা তাড়াহুড়ো করে ফেলে এসেছি, তাতে নতুন ব্যাটারি ভরব বলে ব্যাগ থেকে বের করার পরে আর ভেতরে ঢোকানো হয়নি। এইটুকু টর্চ এইভাবে খরচ করলে একটু পরেই ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে জানি, কিন্তু উপায় নেই বলে এখন করতে হচ্ছে। আমি আমার সামনের লোকটাকে অনুযোগের গলায় বললাম, 'কী আশ্চর্য, আপনাদের বাড়িতে বাতি নেই নাকি? আপনি কি আশা করেন আমি অন্ধকারের ভেতরে রোগী দেখব? সে রকম পাকা অভিজ্ঞতা আমার এখনও হয়নি, বুঝলেন?' লোকটা আমার সূক্ষ্ম বিদ্রূপ গায়ে না মেখে বলল, 'আলো আছে। রোগীর ঘরে। সমস্ত বাড়িতে একটাই হ্যারিকেন তো। এই এলাকায় আজকাল কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না, প্রত্যেক বাড়িতেই এই অবস্থা।'

এতগুলো কথা লোকটা বলল, কি কেবল খসখস করে গলায় আওয়াজ তুলল আমার মনে নেই, তবে আমি যেন সেই শব্দের মানে এই ভাবেই করে নিলাম।

অন্ধকারে কতগুলো ঘর আমরা পার হলাম মনে নেই। টর্চে তখনও যেটুকু আলো অবশিষ্ট ছিল, তাতে দেখি ঘরের মেঝেতে সিমেন্ট বলে কোন পদার্থ নেই, শুধু লাল ইঁট বেরিয়ে আছে, তার ভেতরে জায়গায় জায়গায় গর্ত, যে কোন একটায় পা পড়ে গেলে ফ্র্যাকচার না হলেও নির্ঘাত স্প্রেন্ তো হবেই। কোন ঘরেই আসবাব বলতে কিছু নেই। কোণে কোণে আবর্জনা জড়ো হয়ে আছে। ঘর পেরিয়ে টানা বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে ঘর, তারপর আবার বারান্দা, আবার পর পর কয়েকটা ঘর। বাইরে থেকে বোঝা যায়নি যে এ বাড়িটার ভেতরে এতগুলো ঘর বারান্দা আছে। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো।

আমি থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, 'এ যেন গোলক ধাঁধা মনে হচ্ছে। এই ঘরগুলো আর বারান্দা যেন একটু আগেই আমরা পার হয়ে এসেছি। আপনি পথ ভুলে যাননি তো?'

'এই যে, এই ঘর,' বলে লোকটা তার চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করে দরজা ঠেলে আর একটা ঘরের ভেতরে এনে আমাকে দাঁড় করাল।

একেবারে প্রথমে এই বাড়ির দরজা খুলতে যে গন্ধটা পেয়েছিলাম, সেই গন্ধটা বিকট ভাবে আবার আমার নাকে এসে ঢুকল। মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমি ঘরের চারদিকে চোখ ফেলে প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। তবে ঘরের এক কোণে মিট মিট করে যে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, সেটা দেখতে পেয়ে মনে অনেকখানি স্বস্তি ফিরে এল। যাই হোক, চোখের সামনে আলো থাকলে সব কিছুই জীবনে সহজ হয়ে আসে। আমি ঘরের কোণে লম্বা লম্বা পা

ফেলে এগোতে যাব অমনি ধাক্কা খেলাম যেন কীসে, তাকিয়ে দেখি সেটা একটা খাট। অর্থাৎ খাট ডিঙিয়ে আমাকে ঘরের ওপাশে যেতে হবে হ্যারিকেনটা বড় করে জ্বালাতে। আমি তখন পাশ ফিরে লোকটাকে বললাম, 'আপনি দয়া করে এবার আলোটা বড় করুন, আমি তা না হলে মহিলাকে পরীক্ষা করতে পারব না।'

আমার কথার কোন জবাব পেলাম না। তখন ভাল করে তাকিয়ে দেখি আমার পাশে কেউ নেই। আশ্চর্য, লোকটা তার মেয়েকে দেখাবে বলে এই ঝড় বৃষ্টির রাতে আমাকে অতদূর থেকে রাতের বেলা ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, অথচ আসল জায়গায় এসে সে কেমন টুপ্ করে আমাকে কিছু না বলে সরে পড়ল। পরে মনে হলো, এটাই তো স্বাভাবিক। মেয়েটাকে হয়তো আমি এমন সব কথা জিজ্ঞেস করব বা এমন সব পরীক্ষা করব, যা হয়তো মেয়ের বাপ হিসেবে শুনতে বা দেখতে তার খারাপ লাগবে। অনেক বাপ-মা তাই ছেলেমেয়েকে ডাক্তার পরীক্ষা করলে সরে যায়, এ তো আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তাই বলে–এই সব ভাবতে ভাবতে আমি খাটের দিকে তাকালাম। সেখানে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে মেয়েটি, মাথায় একটা মস্তবড় রুমাল বাঁধা, রুমালটা সাদা, যার জন্যে আধো অন্ধকারেও সেটা দেখা যাচ্ছে, মেয়েটার মুখ অবশ্য আধো আলো আধো অন্ধকারে তেমন বোঝা যাচ্ছে না, তা ছাড়া সে এমন ভাবে পাশ ফিরে শুয়ে আছে যে সাদা রুমালটার অনেকখানি তার মুখের ডান পাশটা ঢেকে রেখেছে, অর্থাৎ যে দিকে আমি দাঁড়িয়ে আছি। এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো মেয়েটি ঘরে একা নয়। তার খাটের চারপাশ ঘিরে মহিলারা বসে আছে। এতক্ষণে আমার চোখ অন্ধকারে সয়ে আসাতে আমি মোটামুটি ভাবে সব দেখতে পাচ্ছি। মহিলারা নিশ্চুপ এবং অনড়। প্রতিটি মহিলা মাথার সামনে একহাত ঘোমটা টেনে বসে আছে। তাদের পাগুলো মাটিতে ঝোলানো, মাথা কিছুটা মাটির দিকে ঝুঁকে আছে। পর্দানশীন অবস্থাপন্ন বাড়ির মহিলারা যেমন হয়। তারা আব্রু বজায় রেখে মেয়েটিকে পুরুষ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাবার সময় নীরবে পাহারা দিচ্ছে। অর্থাৎ এর মানে যে মেয়ের বাপ ঘর ছেড়ে চলে গেলেও আমার মত তরুণ ডাক্তারের সম্পূর্ণ হেফাজতে রেখে সে মেয়েকে ফেলে যায়নি।

আমার শরীর এখন বার বার গুলিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, একটু বমি করতে পারলে ভাল হত। নিজেকে উইলফোর্স দিয়ে সংযত রেখে ব্যাগ খুলতে খুলতে বললাম, 'আপা, বলুন দেখি আপনার কষ্ট কী?'

তরুণী মহিলাদের আপা ও বড় মহিলাদের মা বলে ডাকার অভ্যাস আমরা মেডিকেল কলেজে ক্লিনিকাল করার সময়ই রপ্ত করে নিয়েছি। আমাদের ইউনিটের প্রফেসর এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, সমাজে একমাত্র ডাক্তারদেরই অধিকার আছে মানুষের শরীর, মন ও বাড়ির অন্দর মহলে ঢোকার। সেই অধিকার অর্জন করার আগে একজন ডাক্তারকে অনেক

মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। তার ভেতরে প্রথম হচ্ছে, সমাজের মেয়েদের যারা রোগী হিসেবে কাছে আসবে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে তাদের না জড়ানো। আমি এবং আমাদের ব্যাচের সবাই তাঁর এ উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করেছি। তাই মেয়েটিকে আপা বলতে আমার বাধল না। কিন্তু মুশকিল হলো আমার গলার স্বরটাকে নিয়ে। খুব স্বাভাবিক গলায় প্রশ্নটা করতে চাইলেও মনে হলো আমার গলা দিয়ে যেন ফিসফিস শব্দ ছাড়া আর কিছু বের হতে চাইল না। এমন কী হতে পারে, ঠাণ্ডা লেগে আমার গলা বসে আসছে অথবা আমি শারীরিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি?

আশ্চর্য, আমার প্রশ্নের কোন প্রতিক্রিয়া আমি লক্ষ করতে পারলাম না। মেয়েটি যেমন শুয়েছিল, তেমনি রইল। একটু থেমে তাই আবার বললাম, 'আপনার হাতটা দেখতে পারি কি? দয়া করে হাতটা একটু বের করে দিন, নাড়ীটা দেখি।'

এবার একটু থতমত খেয়ে গেলাম যখন দেখলাম আমার এই অনুরোধেও কোন ফল হলো না। ব্যাপার কী, আমি ভাবলাম। আমার রোগী কি এতই মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে যে ডাক্তারের কথাও সে শুনতে পাচ্ছে না?

আমি ততক্ষণে খাটের পাশে হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে বসেছি। আমার ডাক্তারি ব্যাগ মাটিতে রেখে তার ভেতর থেকে হাতড়ে স্টেথোসকোপটা বের করে গলায় ঝুলিয়ে যতদূর সম্ভব ডাক্তার জনোচিত গাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, 'আপনার বুকটা একটু দেখতে চাই। এভাবে সময় নষ্ট করলে দেরি হয়ে যাবে।' তারপর ফিরে ঘোমটা ঢাকা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আপনারা কেউ ওকে একটু সাহায্য করুন। এমনিতে এই রোগীর ঘরের অবস্থা এমন যে এখানে ভাল মানুষ এলেও অসুস্থ হয়ে পড়বে, তার ওপর যদি এখন ঠিকমত পরীক্ষা করতে না পারি, তা হলে কোন ওষুধ দিতে পারব না।'

আমার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, তার আগেই দেখি দু'জন মহিলা তাদের পূর্বোক্ত সম্ভ্রম বর্জন করে মুহূর্তে লাফ দিয়ে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে একবার তাদের চলে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করে আবার ঘরের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে দেখি অন্য দু'জন মহিলা মুমূর্ষু রোগীর মুখের কাপড় ধরে টানাটানি করছে এবং তাদের মুখ দিয়ে এমন একটা অব্যক্তধ্বনি বের হচ্ছে যা একমাত্র বোবারা ভীষণ রেগে গেলে করে। এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে তাদের বাধা দিতে যেতেই একটা প্রাণ-ভেদী চিৎকারে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল।

'ওরে, আমাকে কবর দে, কবর দে,' বলতে বলতে খাট থেকে লাফিয়ে উঠল আমার রোগী। ততক্ষণে টানাটানিতে রোগীর মাথায় রুমাল গেছে খসে। রোগী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাটের উপরে। আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে আছি রোগীর দিকে। রোগীর মুখ থেকে পচা মাংস গলে গলে খসে

পড়ছে, সমস্ত শরীরে বিকৃত শবের গন্ধ, তার অর্ধেক গলে যাওয়া হাতে তখনও সোনার চুড়ি ঝকমক করছে, সাদা হাড় বেরোনো গলায় তখন সোনার হার, গলে যাওয়া নাকে তখনও সোনার ফুল! আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরে এলে চেয়ে দেখি, আমি আমাদের হেলথ কমপ্লেক্স-এর রোগীর বিছানায় শুয়ে আছি। আমার পাশে আমার সহকর্মী ডাক্তাররা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারদের সঙ্গে আছে নার্স আর আছে একজন অচেনা লোক। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার বাঁ হাতে দেয়া হচ্ছে গ্লুকোস ড্রিপ্, ডান হাতটা বেঁধে রাখা হয়েছে খাটের বাজুর সঙ্গে গজ দিয়ে। আমি কি খুব অস্থিরতা প্রকাশ করেছিলাম?

আমাকে জেগে উঠতে দেখে নার্স আমার মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে তাপ পরীক্ষা করে ডাক্তারকে দেখাল। আমার সহকর্মী ডা. নাসির বলল, 'জ্বর একশো দুই, তার মানে টেম্পারেচার কমে আসছে। বেশ।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'এখন কেমন লাগছে আপনার?'

আমি বললাম, 'ভাল।'

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কী হয়েছিল?'

আমার কথার জবাব দিল না কেউ। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এরপর সেই অচেনা লোকটা এগিয়ে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। লোকটার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ হবে, চোখে মুখে ক্ষুধার্ত একটা ভাব, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল এলোমেলো। লোকটা বলল, 'আমি আপনাকে কোঠাবাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখে তুলে এনেছি, ডাক্তার সাহেব।'

'কোঠাবাড়ি, কোন কোঠাবাড়ি?'

'নেলসন সাহেবের কোঠাবাড়ি। ওই বাড়িতে এর আগে আপনার মত আরও কয়েকজন ডাক্তার রাতের বেলা রোগীর কল পেয়ে রোগী দেখতে গিয়ে হয়রান হয়েছে। আমি ওই এলাকার আশেপাশেই থাকি। নেলসন সাহেব-এর নীলচাষ শেষ হয়ে গেলে ওই এলাকার জমিদার ওই কোঠাবাড়িটাকে তার নায়েবের বসবাসের জন্যে দান করে। শুনেছি তার নায়েবের মত নিষ্ঠুর লোক ওই এলাকায় সেই আমলে আর একটাও ছিল না। তার নিজের বিধবা মেয়েটি যখন তারই অধীনস্থ এক নিচু ঘরের কর্মচারীর সঙ্গে পালিয়ে চলে যায়, তখন নায়েব তাঁদের দু'জনকেই খোঁজ করে ধরে নিয়ে আসে। কর্মচারীটির হদিস আর পাওয়া যায় না পরে। নায়েব তার অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটিকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে এবং গোপনে বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে মেয়েটির গর্ভপাত করানোর চেষ্টা করে।'

আমি অবাক হয়ে যাই লোকটির কথা শুনে। অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'তারপর?'

'তারপর মরো মরো হয় মেয়েটির অবস্থা, গর্ভপাত হয় না। তখন নায়েব

ডাক্তার দেখাবার জন্যে ছুটোছুটি করতে থাকে। মনে হয় এমনিতে নিষ্ঠুর প্রকৃতির হলেও নিজের এই মেয়েটিকে সে ভালবাসত। যাইহোক মেয়েটি অনতিবিলম্বে মারা যায়। নায়েব তখন তাকে কবর না দিয়ে তার মৃতদেহ এক মাস তার শোবার ঘরেই সযত্নে রেখে দেয়, যেন সে মারা যায়নি এমনি ভাবে। এরপর তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে পাগলের মত শুধু বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং মৃত মেয়ের নাম ধরে ডাকতে থাকে। তার সংসারে ভাঙন ধরে। অন্য ছেলেমেয়েরা ছত্রখান হয়ে যায়। বউ মারা যায়। বাড়ি ভর্তি আত্মীয় স্বজন কিছু মরে, কিছু তাকে ছেড়ে চলে যায়। লোকে তখন বলাবলি করতে থাকে যে মেয়েটির অভিশপ্ত আত্মা ধ্বংস ডেকে এনেছে তার সংসারে। এসব আমরা খুব ছোট বেলায় নানী-দাদীদের মুখে শুনেছি। নায়েব নিজেও এরপর একদিন ঝড়বৃষ্টির রাতে কোঠাবাড়ির জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরে যায়।'

লোকটা কথাগুলো বলে আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি তখন সচেতন হয়ে বললাম, 'আপনি কে?'

লোকটা আমার কথা শুনে মৃদু হাসল এবং হঠাৎ চলে যেতে যেতে বলল, 'আমি কেউ না। সাধারণ একজন গ্রামবাসী।'

আমি আমার সহকর্মীদের দিকে তাকালাম। মনে হলো ওরা আমার আগেই এই কাহিনী শুনেছে। ডা. নাসির আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলল, 'লোকটা মনে হয় নায়েবের বংশেরই কেউ হবে। এখন আর কাউকে জানান দিতে চায় না।'

আমি তাই শুনে চোখ বুজে পাশ ফিরে বিড় বিড় করে বললাম, 'এইবার গন্ধটার উৎপত্তি ধরতে পেরেছি। মেডিকেল কলেজে মরচুয়ারীতে এই গন্ধ আমি পেয়েছি। অ্যানাটমি ডিসেকসন হলে পাশেই ছিল এই মরচুয়ারী। শংকর সেখানে সারাদিন বসে বসে পোস্টমর্টেম করা বডিগুলো সেলাই করত। কতকগুলো বেওয়ারিশ লাশ পচে যেত, গন্ধ ছড়াত। এই রকম গন্ধ তখন সর্বক্ষণ সেখানকার বাতাসে ছড়িয়ে থাকত। আমরা মরচুয়ারীর সামনে দিয়ে যাবার সময় এই গন্ধটা পেতাম আর আমাদের গা গুলিয়ে উঠত।'

'কী বলছেন আপনি?' আমার সহকর্মী ঝুঁকে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'কিছু না।'

আনোয়ারা সৈয়দ হক

প্রেত

অনেকক্ষণ ধরে কলিংবেল বাজছে। লক্ষ করেছি, আমি যখন কোন কাজে ব্যস্ত থাকি ঠিক তখনই হয় কলিংবেল, না হয় টেলিফোন বাজতে থাকে। সেই শব্দে আর কাউকে ব্যস্ত হতে দেখা যায় না। অথচ বাসায় আমার স্ত্রী রুবা আছে, দশ-এগারো বছরের একটি কাজের ছেলে আছে–গিল্টু মিয়া। রুবা অবশ্য তার এই ভয়াবহ নাম পাল্টে রেখেছে অনীক। সংক্ষেপে অনি। যে কোন সামান্য বিষয় নিয়ে আহ্লাদ করার ক্ষমতা রুবার অসাধারণ। এই নাম নিয়েও তার আহ্লাদ কম না। তার আবার টেলিফোন ম্যানিয়াও আছে। টেলিফোন ধরলেই নাকি গা শিরশির করে, মাথা ঘোরে। কিন্তু কলিংবেলের শব্দে কেউ দরজা খুলবে না, এটা কেমন কথা?

বিরক্ত হয়ে আমিই উঠলাম দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। দরজা খুলে বিরক্তি আরও বাড়ল। নিতান্তই অপরিচিত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ছোট সাইজের একটা ব্রিফকেস। পরনে কালো প্যান্ট এবং হালকা ঘিয়া রঙের সার্ট। চোখে গোল্ডরিমের চশমা। মুখে দু'এক দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আগন্তুক হাসিমুখে বলল, 'কী রে শালা। কেমন আছিস···?'

সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললাম–কী আশ্চর্য! হাসান দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। আমার স্কুল এবং কলেজ লাইফের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। একমাত্র ওই আমার নামটা সংক্ষেপ করে নিয়ে 'শালা' বলে ডাকত। কারণ আমার নাম ছিল, মোঃ সাইখ আল লাইজ ইবনে ইসলাম। এই বিচিত্র নাম রেখেছিলেন আমার দাদাজান। এর অর্থ আমি আজও জানি না। হাসান মাঝে মাঝে খেপাত, 'শালা তোর নামটা, "সাইখ" না হয়ে "শাইখ" হলে ভাল হত। শালা ডাকটা বিশুদ্ধ হত।'

সেই হাসান আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বিশ্বাসই হচ্ছে না। কত পরিবর্তন হয়েছে চেহারার! শুধু সেই পরিচিত ডাক আর হাসি না হলে হয়তো চিনতেই পারতাম না। কলেজ থেকে বের হওয়ার পর থেকে ওর সাথে আমার আর কোন যোগাযোগই ছিল না। যতদূর শুনেছিলাম, সিলেট মেডিকেলে চান্স পেয়েছিল।

'কী রে! ঢুকতে দিবি না?'

ওর কথায় চমক ভাঙল। হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে এসে সোফায় বসালাম। আর ঠিক তখুনি আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। মনে হলো, আমি যেন অসীম অনন্ত এক গহ্বরে পড়ে যাচ্ছি। এই পতনের কোন শেষ নেই। চমকে উঠে ওর হাত ছেড়ে দিলাম। সম্ভবত আমার চমকে ওঠা ও লক্ষ করল না। গভীর আগ্রহে আমার ঘর দেখতে লাগল। বললাম, 'তুই একটু বস। তোর ভাবিকে

ডেকে নিয়ে আসি।'

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি এলাহি কাণ্ড। রুবা প্রবলবেগে হাঁড়িতে কী যেন নাড়ছে, গিল্টু মিয়া হাত-পা ছড়িয়ে বিপুল উৎসাহে একগাদা পেঁয়াজ কাটছে। এই ছেলের পেঁয়াজ কাটার দক্ষতা অসাধারণ। চোখের নিমেষে কেজিখানেক পেঁয়াজ কেটে দিয়ে বলে, পেঁয়াজ কাটন যে কী ঝামেলা, খালি চউখ চুলকায়। বলেই হেসে দেয়। তাকে দেখে মনে হয় না যে পেঁয়াজ কাটা ঝামেলার কাজ। রুবা সম্ভবত নতুন কিছু রান্না করছে। তার মাঝে মাঝেই রেসিপি বুক দেখে নতুন কিছু রান্না করার শখ মাথাচাড়া দেয়। বেশিরভাগই তৈরি হয় অখাদ্য, মুখে দেওয়া যায় না। ওর নতুন রান্না দেখলেই আমার বুক ধড়ফড় করে। শুধু গিল্টু মিয়ার চোখ চকচক করতে থাকে। খেয়ে বলে, 'কী জিনিস খাইলাম গো! বড়ই সোয়াদ। এমুন জিনিস আর খাই নাই।'

রুবাকে বললাম, 'আমার অনেক দিনের পুরনো এক বন্ধু এসেছে। তোমার উদ্ভট রান্না থামাও, এসো পরিচয় করিয়ে দেই।' আর গিল্টু মিয়াকে পাঠালাম বাড়ির পাশের এক ভাল রেস্টুরেন্ট থেকে বিরিয়ানি আনতে। ওরা এই জিনিসটা খুব ভাল বানায়। রুবার রান্নার উপর ভরসা করাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

হাসান অনেক বদলে গেছে। আগের সেই উচ্ছলতা আর ওর মধ্যে নেই। কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব চলে এসেছে। রুবার সাথে অবশ্য ও হাসিমুখেই কথা বলল।

'আচ্ছা ভাই, ও কি আগে থেকেই এরকম কাঠখোট্টা স্বভাবের?' রুবা আমার প্রতি ইঙ্গিত করল।

'খুব একটা গম্ভীর স্বভাবের তো ও কখনোই ছিল না,' হাসিমুখে জবাব দিল হাসান। 'তবে এখন কেমন হয়েছে, জানি না।'

আমি বললাম, 'গম্ভীর স্বভাবের হয়েছি ওর রান্নার গুণে। খাবারের চেহারা দেখলেই গম্ভীর হয়ে যাই। তুই-ও হবি, দু'এক বেলা খা।'

হাসান হেসে উঠল হো হো করে।

রুবা চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রথম দিনেই হাসান ভাইয়ের কাছে আমার বদনাম করছ? ভাই, আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। জগতের সবকিছুতেই জনাবের বিরক্তি। আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসেন, আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি...'

হাসান হাসিমুখে বলল, 'বেশ সুখেই আছিস তোরা। পুরোপুরি সংসারী।'

হাসলাম, 'আছি মোটামুটি। তা-তুই বিয়ে করিসনি? আছিস কোথায় এখন?'

'আপাতত হোটেলে। আর স্থায়ী নিবাস সিলেট সেন্ট্রাল জেল।'

আমাকে হঠাৎ চমকে দিতে পেরে হাসান শব্দ করে হেসে উঠল। 'তুই যা ভাবছিস, তা নয়। আমি আসামী নই। জেলের ডাক্তার। ডাক্তারি পাশ করে ওখানে ঢুকেছি। প্রত্যেক জেলেই দু'একজন ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। চাকরি বিশেষ সুবিধার না। তবে আমার অসুবিধা হয় না, মানিয়ে নিয়েছি।'

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বললাম, 'এত রাতে হোটেলে ফিরে কী করবি। থেকে যা এখানে। ঘর একটা ফাঁকাই আছে। সারারাত গল্প করা যাবে।'

ও শুধু হাসল। কিছু বলল না। অনেকক্ষণ ধরে আমি একাই বকবক করে গেলাম। রুবা কিছুক্ষণ আমাদের সাথে গল্প-গুজব করল। তারপর হাসানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে চলে গেল।

হঠাৎ হাসান বলল, 'আমার জীবনের একটি ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প শুনবি? অবশ্য তোর বিশ্বাস হবে কিনা জানি না।'

ভাবলাম, সেই চিরাচরিত লাশ কাটা ঘরের গল্প হবে হয়তো। সব মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছেই এরকম অভিজ্ঞতার গল্প শোনা যায়। হেসে বললাম, 'কী, মেডিকেল কলেজের গল্প?'

জবাবে ও বলল, 'না, জেলখানার গল্প।'

এবার কৌতূহল বোধ করলাম। বললাম, 'কী ধরনের গল্প?'

বলল, 'চুপ করে শোন…নিজেই বুঝবি।'

'ঠিক আছে, বল।'

হাসান গল্প শুরু করল:

'আমি নতুন কাজে জয়েন করেছি। তখনকার কথা। জেলখানার পরিবেশের সঙ্গে তখনও পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারিনি। সবসময় মনে হত, একদঙ্গল দাগী আসামীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অবশ্য অল্প দিনেই ব্যাপারটা সয়ে গেল। জেলখানার অনেক কয়েদীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। অনেক নির্দোষ লোককেও দেখলাম, যারা মিথ্যা মামলায় হেরে গিয়ে শাস্তি ভোগ করছে। খুব খারাপ লাগত এসব দেখে। অবশ্য মন ভাল হওয়ার মত ব্যাপারও ছিল। যেমন একজন কয়েদী ছিল খুবই রসিক। অনেক সময়ই তার রসিকতায় বা কৌতুক শুনে হেসেছি প্রাণ খুলে।

মূলত আমার কাজ ছিল কোন কয়েদী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে প্রাথমিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা। বিশেষত কনডেম সেলে (Condemn cell) যাদেরকে রাখা হয়, নিয়মিতভাবে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। এটা একটা রুটিন কাজ। এই কাজে সাহায্য করার জন্য সার্বক্ষণিক একজন লোকও দেওয়া হয়েছিল। তার নাম মনসুর আলী।'

এই পর্যায়ে আমি হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই সব কথা পাস্ট টেন্সে বলছিস কেন? চাকরিটা কি ছেড়ে দিয়েছিস?'

উত্তরে হাসান অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। বলল, সবটা শোন আগে:

'…ঠিক এরকম একটা সময়ে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। কনডেম সেলে একজন ফাঁসির আসামী নিয়ে আসা হলো। অল্প বয়েসী ছেলে। মজার ব্যাপার হলো, সেই ছেলের নামও হাসান। একটি মেয়েকে খুন করার দায়ে আদালত তাকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। তার উকিল উচ্চ আদালতে আপিল করেছিল, লাভ হয়নি। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি। ফলে আগের রায়ই

বলবৎ ছিল। ফাঁসির আসামীকে এত কাছ থেকে এর আগে আর কখনও দেখিনি। ওর কাছে গেলেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হত। মনে হত, আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই জলজ্যান্ত এই মানুষটিকে খুন করা হবে। যদিও সে নিজেও খুনি। তার শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু তারপরেও ছেলেটির জন্য অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করতাম। আসলে ছেলেটির নিষ্পাপ চেহারা দেখে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইত না যে এই ছেলে মানুষ খুন করতে পারে।

ফাঁসির তারিখ নির্ধারণ হয়েছিল প্রায় মাসখানেক পর। আসামীকে সেটা জানানোর নিয়ম নেই বলে সে জানত না। কিন্তু আমরা সবাই জানতাম। এই সময়ের মধ্যে তার অনেক কিছুই আমি জেনে ফেললাম। এমনিতে সে সবসময় গম্ভীর থাকলেও, প্রশ্ন করলে উত্তর দিত। কখনও মন ভাল থাকলে নিজে থেকেও অনেক কিছু বলত। বয়সে ও ছিল প্রায় আমার মতই, তাই আমাকে সম্ভবত কথা বলার উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিল।

একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, কেন খুনটা করল সে। মেয়েটি কে? প্রশ্ন শুনে সে খানিকটা বিষণ্ন হয়ে পড়ল। মনে হলো, তার জীবনের এই দুঃখময় স্মৃতি সে মনে করতে চায় না। বললাম, বলতে অসুবিধা থাকলে থাক।

'না-না, অসুবিধা নেই।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ও। 'আসলে আমিও চাচ্ছি, আমার ঘটনাগুলো কাউকে বলে নিজের মন হালকা করি। কেউ অন্তত জানুক, খুনটা আমি কী পরিস্থিতিতে করেছিলাম, কেন করেছিলাম। ওকে এখনও ভীষণভাবে ভালবাসি। তাই যখন দেখলাম, ও এতবড় একটা অন্যায়···একটা পাপ করতে যাচ্ছে, তখন খুন করাটাই আমার কাছে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছিল। বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমার হাতে আর কোন পথ খোলা ছিল না।' এই পর্যন্ত বলে সে একটু থামল। আমি কিছু বললাম না। ভাবলাম, নিজের ইচ্ছেতেই বলুক। একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করল, 'আমিও মেডিকেলের একজন ছাত্র। শেষ বর্ষে ওঠার পর খুনটা করি।'

যারপরনাই বিস্মিত হলাম। কিন্তু কথার মাঝে বাধা দিলাম না।

সে বলে চলল, 'আমি যখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি, তখন আমাদেরই ক্লাসের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে যাই। ব্যাপারটা আচমকা হয়নি। প্রথম থেকেই মেয়েটিকে আমার ভাল লাগত। কিন্তু আগে কখনও সাহস করে মনের কথাটা বলতে পারিনি। দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর মেয়েটির সাথে আমার আন্তরিকতা বাড়ল। মনে হলো, ও-ও সম্ভবত আমাকে পছন্দ করে। আমি পড়াশোনায় ভাল ছিলাম। ও কখনও নোট নিতে অথবা পড়া বুঝে নিতে আসত। তখন গল্প-গুজবও হত। সেরকমই একদিন, গল্প করার এক ফাঁকে সাহস করে বলে ফেললাম, আমার মনের কথাটা। খুব অবাক হলো। তারপর লাজুকমুখে জানাল, ও-ও আমাকে পছন্দ করে। কিন্তু সাহস করে কখনও বলতে পারেনি। যদি আমি না করি, এই ভয়ে।

'আনন্দে আমার চিৎকার দিতে ইচ্ছা করল। মনে হলো, একটা মাইক ভাড়া

করে বের হয়ে পড়ি, শহরের সবাইকে জানিয়ে দিই এই আনন্দের কথা।

'এরপরের পুরো একটা বছর সুখ সাগরে ভাসলাম। আন্তরিক প্রেম যে এতটা আনন্দময় ব্যাপার, এ সম্পর্কে আগে আমার কোন ধারণাই ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই ক্লাসের পর একসাথে বের হয়ে পড়তাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত দুজন কোথাও বসে থাকতাম। হয়তো কোন পার্কে বা ফাঁকা কোন নিরিবিলি জায়গায়। মোটকথা, আমি আমার সারা জীবনে এত আনন্দময় সময় আর কখনও কাটাইনি।

'কিন্তু সমস্যা শুরু হলো তৃতীয় বর্ষে পড়ার শেষ দিকে। হঠাৎ করেই মনে হলো, ওর মধ্যে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন এসেছে। আগের সেই উচ্ছলতা আর নেই। আমার সাথে কথাও বলে দায়সারা ভঙ্গিতে। হয়তো ক্লাসের পর বললাম, চল কোথাও থেকে ঘুরে আসি। ও বলত, আজ না, আরেকদিন। আজ ভাল লাগছে না। পরিষ্কার বুঝতাম যে, আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। শেষে একদিন উপায় না দেখে ওকে ডেকে পাঠালাম। জানতে চাইলাম কী হয়েছে? বলল, কই কিছু না তো! অনেকভাবে জিজ্ঞেস করলাম, সমস্যাটা কোথায়? আমাদের জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল কেন? কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন জবাব পেলাম না।

'এভাবে দিন কাটতে লাগল। হঠাৎ আমার এক বান্ধবীর মুখে এমন এক কথা শুনলাম, যা শুনে মনে হলো, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। জানলাম, আমার ভালবাসার মানুষ, যাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি, সে নাকি এখন আমাদের এক সিনিয়র ভাইয়ের প্রতি দুর্বল। তার সঙ্গে নাকি মাঝে মাঝে ঘুরতেও বের হয়। আমি কোন কিছুই বিশ্বাস করতে পারলাম না। ছুটে গেলাম ওর কাছে। সবকথা খুলে বলে জানতে চাইলাম এসব সত্যি কিনা। ও সরাসরি সব কিছু অস্বীকার করল। বলল, সে শুধু একজনকেই ভালবাসে...আমাকে। আর ওই সিনিয়র ভাইকে শুধু বড়ভাই বলেই জানে, এর বেশি কিছু না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হলো, বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। তবু মনের এক কোনায় একটা অস্বস্তি রয়েই গেল।

'এর কয়েকদিন পরের কথা। বন্ধুর সঙ্গে নিউমার্কেটে গেছি। টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। চিন্তা করছি কোথায় দাঁড়ানো যায়। হঠাৎ বন্ধুটি আমার হাত চেপে ধরল। চোখ বড়বড় করে বলল, দেখ! দেখ! আমি যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। দেখি ও একটা ছেলের হাত ধরে হাসতে হাসতে নিউমার্কেটের গেট দিয়ে বের হচ্ছে। ছেলেটি আর কেউ নয়, আমাদের সেই সিনিয়র ভাই! আমার বুকটা ভেঙে গেল। কী যে অবর্ণনীয় কষ্ট পেলাম, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাচ্ছে। কীভাবে বাসায় ফিরে এসেছি নিজেও জানি না।

'হঠাৎ করেই সিদ্ধান্তটা নিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম...ওকে মেরে ফেলব। ও একই সাথে আমাদের দুজনের সাথে প্রতারণা করছে, দুটি জীবন নিয়ে খেলছে। এতবড় অন্যায় ওকে করতে দিতে পারি না। ঠিক করলাম, ওকে মেরে ফেলে, আমিও আত্মহত্যা করব। কেবলমাত্র এভাবেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব ওই সিনিয়র

ভাইটির হাত থেকে। সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর নিজেকে অনেক হালকা মনে হলো।

'ধীরে ধীরে মনকে প্রস্তুত করতে শুরু করলাম। এরমধ্যে ওকে বেশ কয়েকবার ফলো করে নিশ্চিত হয়েছি, একসময় যে অভিনয় ও আমার সাথে শুরু করেছিল, সেই একই খেলা এখন চালাচ্ছে সিনিয়র ভাইটির সঙ্গে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ওকে ল্যাবে দেখা করতে বললাম। ওই সময়টায় ল্যাব নির্জন এবং ফাঁকা থাকে। আমার পকেটে পটাশিয়াম সায়ানাইডের শিশি, হাতে নাইলন কর্ড। কোন কিছু সন্দেহ না করেই ও ল্যাবে ঢুকল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে গলায় নাইলন কর্ডের ফাঁস আটকে নিলাম। অন্য হাতে চেপে ধরলাম ওর মুখ। কিছুক্ষণ হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করল, তারপর সব শেষ। মারা যেতে সব মিলিয়ে মিনিট পাঁচেক সময় নিল। এত সহজে একজন মানুষকে মেরে ফেলা যায়, আমার বিশ্বাস হতে চাইছিল না। নিথর দেহটা আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিলাম। আমি বরাবরই ভীতু স্বভাবের। তাই বিষের শিশি পকেটে থাকা সত্ত্বেও খেতে পারলাম না। বরং সত্যিই সত্যিই মারা গেছে এটা বুঝতে পেরে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম। তারপর ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। আমার চিৎকারে কৌতূহলী ছেলেরা ছুটে এসে আমাকে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে এবং পুলিশে খবর দেয়। দ্যাটস অল···এই হলো আমার জীবনের গল্প···'

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে গল্প শুনছিলাম, এখন হঠাৎ নিস্তব্ধতায় চমক ভাঙল। অবাক হয়ে দেখি, ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। বলল, 'বুঝলেন, জীবনে কখনও কোন মেয়েকে বিশ্বাস করবেন না। মেয়ে মানেই বিশ্বাসঘাতক। ভালওবাসবেন না কাউকে।

বললাম, 'একটি মেয়েকে দেখে সব মেয়ের বিচার করা কি ঠিক? সবার মধ্যেই ভালমন্দ আছে।' ও কোন কথা বলল না, জ্বলন্ত চোখে শুধু একবার তাকাল আমার দিকে। হঠাৎই পরিবেশটা অসহনীয় মনে হলো। আর কিছু না বলে চলে এলাম ওর কাছ থেকে।

এরপর থেকে ও আমার সাথে কথাবার্তা একেবারেই কমিয়ে দিল। কিছু জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ-না এর মধ্যেই সারার চেষ্টা করত। মনে হলো, ওর যা বলার ছিল, বলে ফেলেছে। আর কিছু বলার নেই।

এরমধ্যে ফাঁসির দিন চলে এল। আজ রাত ১২টা ১ মিনিটে হাসান নামের ছেলেটির ফাঁসি কার্যকর করা হবে। সারাদিন ধরে চলেছে ব্যাপক প্রস্তুতি। আমার খুবই খারাপ লাগছে। সময় যত এগিয়ে আসছে খারাপ লাগার ভাবটা ততই বাড়ছে। চোখের সামনে জলজ্যান্ত একজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলতে দেখা খুবই শক্ত। মন থেকে ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। দুপুরে দেখা করতে গেলাম। ও সম্ভবত আমার চেহারা দেখেই কিছু একটা অনুমান করে নিল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

নিয়ম মাফিক ফাঁসি কার্যকর করার ৩ ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ রাত ১০ টায়

জেলার সাহেব নিজে এসে ওর সাথে দেখা করলেন এবং আজ রাতে তার ফাঁসি কার্যকর করার হুকুমনামা পড়ে শোনালেন। হাসান নির্বিকার মুখে শুধু শুনে গেল। একজন মাওলানা আনা হয়েছিল। তিনি ওকে ওযু করিয়ে তওবা করালেন এবং এশার নামায পড়ার পর চার রাকাত নফল নামায পড়ার পরামর্শ দিলেন। ও সব নির্দেশ নিঃশব্দে পালন করল। তারপর আমার সাথে দেখা করতে চাইল।

যেয়ে দেখলাম, ও চুপচাপ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পাশে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবে? হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে, ও আমার ডান হাতটা দু'হাতে চেপে ধরে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল। বলল, মৃত্যুর পর কোথায় যাব আমি জানি না, খোদা আমাকে কী শাস্তি দেবেন তাও জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, পিয়ালকে খুন করে আমি কোন অন্যায় করিনি। বরং ওকে একটা অন্যায় করা থেকে বাঁচিয়েছি। কথাটা আপনার কাছে হয়তো হাস্যকর শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি। একটু থামল ও, তারপর চোখ বড়বড় করে বলল, ডাক্তার, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু···কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, পিয়াল আমাকে নিতে এসেছে। ওর সেই পরিচিত হাসি আমি শুনেছি। জানেন ডাক্তার, ওর মত সুন্দর হাসি আর কোন মেয়ের মুখে আমি দেখিনি।

সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না। কারণ আমার নিজের চোখও তখন ভিজে উঠেছে। শুধু বললাম, ও নিশ্চয় এখন জানে, তুমি তাকে পাগলের মত ভালবাসতে বলেই এ কাজ করেছ। আমার বিশ্বাস সে তোমাকে মাফ করে দিয়েছে এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তোমার আসার।

হাসান উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, থ্যাংকস ডক্টর। তাই যেন হয়।

ওকে ফাঁসির মঞ্চে ওঠানো হলো ১২ টা বাজার ২ মিনিট আগে। মাথা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার আগে একবার আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসার চেষ্টা করল। চোখ তখনও ভেজা। হঠাৎ করে বুকের মধ্যে ভয়ংকর কষ্ট অনুভব করলাম। মনে হলো, দৌড়ে যেয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনি ওখান থেকে। কিন্তু কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা?

ঠিক ১২টা ১ মিনিটে জেলারের নির্দেশে সবকিছু শেষ হয়ে গেল। পোস্টমর্টেমেরও দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। পোস্টমর্টেম করে, মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার সার্টিফিকেট দিতে হবে। এর কোন দরকার ছিল না। ছেলেটির ঘাড়ের কশেরুকা বিচ্ছিন্ন হয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছে। সম্ভবত মৃত্যু যন্ত্রণা টের পাওয়ারও সময় পায়নি। যাই হোক, সব কিছু শেষ করে, ডেথ সার্টিফিকেট রেডি করে, বাড়ি ফেরার উদ্দেশে জেল কম্পাউন্ডের ভিতরে পা রাখলাম। মেইন গেটের দিকে এগোতে যাব, এই সময় একটা ব্যাপার হলো। প্রচণ্ড ভয়ে আমার শরীর কেঁপে উঠল। পা দুটো অসাড় হয়ে গেল। মনে হলো, আমার চারপাশে কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কিছু, যার সাথে এই চেনা জানা জগতের কোন যোগাযোগ নেই। হঠাৎ করেই প্রবল ইচ্ছে হলো, কিছু দূরের ফাঁসি মঞ্চের দিকে

তাকানোর। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, ওদিকে তাকালেই ভয়ংকর কিছু একটা দেখব আমি, যা হয়তো সহ্য করতে পারব না। মনের প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফাঁসি মঞ্চটার দিকে ঘুরে তাকালাম। দেখলাম...

এই পর্যন্ত বলে থামল হাসান। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলাম। গল্পের উত্তেজনায় কখন যে সোফায় পা তুলে বসেছি, খেয়াল করিনি।

হাসান বলল, 'বলছি। তার আগে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি আন। গলাটা ভিজিয়ে নেই।'

ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করলাম। সাথে হালকা কিছু খাবার নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলাম। বসার ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ মনে হলো, কোথাও কেউ নেই। হতভম্ব হয়ে দেখলাম, সোফার মধ্যে খুব ধীরে ধীরে একটা ছায়া হাসানের আকৃতি নিচ্ছে। হাত-পা, মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ কারণটা বুঝতে পেরে মনে মনে হেসে ফেললাম। আসলে হাসান ওর জায়গায় ঠিকই আছে, আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে গেছে। এজন্য এরকম মনে হয়েছে। রাত জাগার ফল। মাথা জট পাকিয়ে গেছে।

'কী রে! বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

ওর কথায় চমক ভাঙল। সোফার সামনের টেবিলের উপর হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রাখলাম। হাসান বোতল খুলে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেল। লক্ষ করলাম, চোখজোড়া লাল হয়ে গেছে। বললাম, 'তুই না হয় ঘুমিয়ে পড়। গল্পের বাকিটা কাল শুনব।'

'না,' বলে মাথা নাড়ল হাসান। 'পুরোটা একবারে না শুনলে ভাল লাগবে না।'

আমি আর কিছু বললাম না।

ও আবার শুরু করল:

'...ভয়ে আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। জানি না কীসের আকর্ষণে ধীরে ধীরে ঘুরে তাকালাম ফাঁসির মঞ্চের দিকে এবং দেখলাম...হ্যাঁ পরিষ্কার দেখলাম, একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর। ছায়ামূর্তিটির মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মূর্তিটি সম্ভবত এক হাত উঁচু করার চেষ্টা করল, কিন্তু হাত বাঁধা থাকায় পারল না। কতক্ষণ সেখানে নিজেই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হুঁশ ফিরল মনসুরের ডাকে।

'কী ব্যাপার, সার! এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?'

হাত ইশারায় মনসুরকে কাছে ডাকলাম। সে এগিয়ে এল। আমার চোখমুখ দেখে সম্ভবত কিছু একটা আঁচ করল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, সার?'

কাঁপা গলায় বললাম, 'মনসুর, ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখো তো। কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'কই! না তো স্যার, কিছু দেখলাম না।'
'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি তো রাতে থাকছ, তাই না?'
'জ্বি, সার।'
'কোন সমস্যা হলে ফোন কোরো।'
'আচ্ছা, সার।'

আমি দ্রুত গেটের দিকে পা চালালাম। ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারলাম মনসুর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় কিছুটা ভয়ও পেয়েছে।

বাসার গেটে আসার পর বুঝলাম কী পরিমাণ ক্লান্ত আমি। পা দুটো যেন আর চলতে চাইছে না। মনকে বোঝালাম, যা দেখেছি শরীর ও মনের উপর ভয়ংকর চাপের কারণেই দেখেছি। হ্যালুসিনেশন, আর কিছু না। মন অসম্ভব উত্তেজিত বা ক্লান্ত থাকলে মানুষ অনেক সময় উল্টোপাল্টা জিনিস দেখে বা শোনে। এরপর হয়তো কিছু শুনতেও পাব।

কলিংবেল বাজানোর অনেকক্ষণ পর কাজের ছেলেটা দরজা খুলে দিল। আমি বিয়ে করিনি। ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য একটা কাজের ছেলে আছে। আর একটা ঠিকা ঝি এসে তিনবেলা রান্না করে দিয়ে যায়। অসুবিধা তেমন একটা কখনও হয় না। কিন্তু এই প্রথম মনে হলো, ঘরে একজন সঙ্গী থাকা দরকার। যার সাথে মন খুলে সব কথা বলা যায়। ফিরতে রাত হলে যে কৈফিয়ত তলব করবে, 'কী ব্যাপার, এত রাত করলে? তোমার জন্য না খেয়ে বসে আছি। শরীর খারাপ করেনি তো?'

টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। কিন্তু তুলে খাওয়ার শক্তিটুকুও নেই। কোনমতে জুতো জোড়া ছেড়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি। এই সময় বেয়াড়া শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ভয়ানক চমকে উঠলাম। মনের দিক দিয়ে কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছি চিন্তা করে অবাক লাগল।

টেলিফোনটা ধরার আগে মনে হলো, ওটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক আস্তে বাজছে। সেটের কোন গণ্ডগোল কিনা বুঝতে পারলাম না। রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকালাম, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

ও প্রান্তে শুধু দুর্বোধ্য ফিসফিসানি শোনা গেল। মনে হলো, কোন ছোট বাচ্চা জীবনে প্রথম শিস দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শব্দ হচ্ছে না।

'হ্যালো, কে আপনি? আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না।' আবার সেই ফিসফিস শব্দ। তারপর লাইন কেটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে এক্সচেঞ্জে ফোন করলাম। অপারেটরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, কোন নাম্বার থেকে আমাকে এই মাত্র ফোন করা হয়েছিল?'

কিছুক্ষণ পর অপারেটর আমাকে একটা নাম্বার দিল। অবাক হয়ে দেখলাম, এটা জেলখানায় আমার চেম্বারের নাম্বার। ওখানে এখন মনসুরের থাকার কথা।

অপারেটরকে বললাম, 'আমার লাইনটা ওখানে দিন, প্লিজ।'

সংযোগ পেলাম। মনসুর ফোন ধরল।

'হ্যালো?'

'হ্যালো, কে মনসুর? আমি হাসান।'

'জ্বি, সার, বলেন।'

'তুমি কি এইমাত্র আমাকে ফোন করেছিলে?'

'জ্বি-না সার। আমি তো আপনাকে ফোন করিনি।'

'তুমি কি নিশ্চিত? অপারেটর জানাল এই নাম্বার থেকে এসেছে।'

'আমি নিশ্চিত, সার। অপারেটর নিশ্চয় ভুল করেছে।'

'ঠিক আছে, ফোন রাখছি।'

'ঠিক আছে, সার, স্লামালিকুম।'

ফোন রেখে চেয়ারে এসে বসলাম। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া। কাজের ছেলেটিকে ডাকতে যেয়ে দেখি বেচারা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে এসে না খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন যথারীতি কাজে গেলাম। জেল কম্পাউন্ডের মধ্যে পা দিয়েই আবার কাল রাতের মত অনুভূতি হলো। কোন কারণ ছাড়াই ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। অনুভূতিটা রাতের মত অত তীব্র না হলেও খুব কমও না। পরিষ্কার অনুভব করলাম আমার চারপাশে অশরীরী কোন কিছুর অস্তিত্ব।

চেম্বারে যাওয়ার আগেই মনসুরকে পেলাম। ওকে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হলো। অথচ ওর মত সাহসী লোক আমি খুব কম দেখেছি।

'কী ব্যাপার, মনসুর?'

'সার···। গলা কেঁপে গেল মনসুরের। 'আমি ঠিক জানি না এখানে কী হচ্ছে। কিন্তু আমি আর রাতে এখানে থাকব না।'

'কেন, কী হয়েছে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'কিছু একটা আছে এখানে, সার···অন্য কিছু।' ও ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলল।

'অন্য কিছু মানে?'

'আমি ঠিক জানি না, সার। কাল রাতে আপনি ফোন করার আগে পর্যন্ত মনে হয়েছে, আমি ভুল দেখেছি। মাথায় কিছু হয়েছে। কিন্তু···'

মনসুরকে টেনে নিয়ে আমার চেম্বারে ঢুকলাম। ওকে চেয়ারে বসিয়ে বললাম, 'মনসুর, আমাকে সব কিছু খুলে বল। হয়তো আমি কিছু বুঝতে পারব। কালরাত থেকে আমারও একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে।' আমার কথা শুনে ওর মুখ আরও শুকিয়ে গেল।

বলল, 'সার···সার বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কালরাতে আমি সত্যিই কিছু একটা দেখেছি···ফোনের কাছে।'

'কিছু খাওনি তো? তোমার তো আবার মাঝে মধ্যে মদ্যপানের অভ্যেস আছে।'

'খোদার কসম, সার!' মনসুর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। 'কালরাতে এক

ফোঁটাও ছুঁয়েও দেখিনি।'

'কখন দেখেছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'রাতে। আপনি যখন ফোন করলেন, তার সামান্য আগে।'

'তখন বললে না কেন?'

'তখনও, সার, বুঝতে পারিনি। ভেবেছি মনের ভুল। পরে বুঝেছি যা দেখেছি সব সত্যি। তখন, সার, ভয় পেয়েছি, ভীষণ ভয়। সার, বলতে লজ্জা লাগছে, ভয়ে আমি ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বারান্দায় বসে রাত পার করেছি।'

'বুঝতে পারছি। তোমারই যদি এই অবস্থা হয়...,' আর কী বলব ভেবে পেলাম না। আসলে মাথায় সবকিছু জট পাকিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে।

'সার...একটা হালকা ধোঁয়ার মত জিনিস ঘরে ঢুকেছিল। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, মাছের আঁশটে গন্ধ পেয়েছি। ওটা ফোনের চারপাশে ঘুরছিল। আর, সার, কী ভয়ংকর ঠাণ্ডা!'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না, সার। ও...ওহ্ সার, আরেকটা ব্যাপার। আপনার টেলিফোন আসার কিছুক্ষণ আগে, কনডেম সেলের পাশের সেলের কিছু কয়েদী হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। একজন কয়েদি পাগলের মত গরাদে মাথা ঠুকতে থাকে। পরে প্রহরীরা এসে ওদের শান্ত করে।'

'ঠিক আছে, মনসুর। তোমার আজ আর রাতে এখানে থাকার দরকার নেই। দু'একদিন বাসায় বিশ্রাম নাও। টেনশানের কারণেও এরকম হতে পারে। এখানকার কাজ আমিই সামলাতে পারব।'

'ঠিক আছে, সার। ধন্যবাদ।'

মনসুরকে এখান থেকে সরিয়ে দিলাম বিশেষ একটি কারণে। দেখা যাক পরিকল্পনাটা কাজে লাগে কিনা। আরও কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু আমার একার পক্ষে এতসব করা সম্ভব না। কাজেই সে চিন্তা বাদ দিলাম।

পুরোপুরি বিধ্বস্ত অবস্থায় বাসায় ফিরলাম। সারাদিনে কাজ কিছুই করতে পারিনি। প্রত্যেকটা মুহূর্তেই অনুভব করেছি অপার্থিব কোন কিছুর অস্তিত্ব। কেন জানি মনে হচ্ছে ওটা হাসান। সে সম্ভবত আমাকে কিছু বলতে চায়। যদিও এরকম মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু ও মারা যাওয়ার পর থেকেই এসব ঘটতে শুরু করেছে। আমি ভীতু প্রকৃতির নই। ভূত-প্রেত বিশ্বাসও করি না। তারপরও এরকম মনে হওয়ায় নিজের উপরই বিরক্ত লাগল। ঠিক করলাম আজও রাত ২টা পর্যন্ত জেগে বসে থাকব, দেখি কিছু হয় কিনা। বারে বারেই কেন যেন মনে হচ্ছে আজও ফোন আসবে। ফোনের মাধ্যমে আমাকে কিছু বলতে চেষ্টা করবে। কাল হয়তো মনসুর থাকায় পারেনি। কিন্তু আজ মনসুর নেই।

রাত ২টা পর্যন্ত হাতে একটা বই নিয়ে ফোনের সামনে বসে থাকলাম। বইয়ে মন বসছে না, বার বার টেলিফোনটার দিকে চোখ যাচ্ছে। কাল সম্ভবত

হ্যালুসিনেশনই হয়েছিল। প্রথমে ভিজ্যুয়াল তারপর অডিটরি হ্যালুসিনেশন। কিন্তু মনসুরের ব্যাপারটা? আবার মাথায় সব জট পাকিয়ে গেল। বইয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজির উপরে লেখা। লেখক লিখেছেন ভালই, প্রতিটি চ্যাপ্টারই খুব গুছিয়ে লেখা আর উদাহরণ টেনেছেন প্রচুর। কিন্তু পড়া এগোচ্ছে না, কী পড়ছি কিছুই মাথায় ঢুকছে না...

হঠাৎ করেই ফোনটা বেজে উঠল। আবারও চমকে উঠলাম, তবে কালকের মত না। কেউ বলে না দিলেও বুঝতে পারছি, কালকের ফোনই এসেছে। ফোনটা বাজছে মৃদুভাবে। মনে হচ্ছে, পাশের বাড়ির টেলিফোনের আওয়াজ। কাঁপা হাতে রিসিভার তুললাম। 'হ্যালো?'

টেলিফোনের অপর প্রান্তে আজ আর ফিসফিসানি নেই। তার বদলে চাপা কান্না আর ফোঁপানির মত শব্দ। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। এরকম বীভৎস গোঙানি কোন মানুষের কণ্ঠ দিয়ে বের হতে পারে না। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত-পা অসাড় মনে হলো। কাঁপা গলায় আবার বললাম, 'হ্যালো? কাকে চাচ্ছেন?'

জবাবে আবার শুনতে পেলাম সেই ভয়ংকর ফোঁপানি। মনে হলো, অনেক দূর থেকে কিছু কথা ভেসে আসছে। অনেকক্ষণ পর শুনলাম, 'ডা...ডাক্তার?'

'জ্বী, হ্যাঁ, বলছি। বলুন...'

'আ-আ-আমি ব...বলতে চাই। অবশ্যই চাই। পাপ...পাপ খণ্ডাতে চাই।'

'আপনি কে বলছেন?' যদিও আমি জানতাম উত্তরটা কী হবে।

'আ...আমি? আ...আমি কে? ...কে? আমি...আমি হাসান।'

আবারও শিউরে উঠলাম। এটা অসম্ভব। হতেই পারে না। একজন মৃত মানুষের আমার সাথে কথা বলার কোন কারণ নেই। তাও আবার ফোনের মত একটা আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে। আসলে সম্ভবত কিছুই ঘটছে না। সব আমার কল্পনা। তবুও বললাম, 'বলো, কী করতে পারি তোমার জন্যে।'

'আ...আপনি তাকে বলেন। তাকে...আসতে বলেন।'

'কাকে আসতে বলব? কোথায়?'

'সেই...সেই টুপিওয়ালা। দাড়িওয়ালা...লোক। যিনি আমার মৃত্যুর আগে এসেছিলেন।'

'আচ্ছা আচ্ছা! সেই মাওলানা সাহেব?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ। তাকে...তাকে এখানে...আসতে বলেন। কাল রাতে। আ...আমি আর পা...পারছি না। খুব...খুব ঠা...ঠাণ্ডা এখানে। কাল আসতে...বলেন। রাতে...। খু-উ-উ-ব ঠাণ্ডা-আ-আ-আ...'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল কণ্ঠটা। সেই সঙ্গে ফোঁপানিও ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল।

হতভম্ব হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। লক্ষ করলাম, গায়ের কাপড় ঘামে ভিজে গেছে। কপাল এবং জুলফি বেয়ে পানি নামছে। বুক ধড়ফড় করছে। এই আষাঢ়ে

গল্প মাওলানা সাহেবকে বলার কোন মানেই হয় না। ওঁনাকে যদি বলি, গতকাল যাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, সেই হাসানের আত্মা ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, তবে তিনি নির্ঘাত আমাকে পাগল ঠাওরাবেন। সামনে হয়তো ঠিকই হ্যাঁ-হুঁ বলবেন। আড়ালে গেলেই বলবেন, ব্যাটা বদ্ধ পাগল। এই অবস্থায় চাকরি করছে কীভাবে?

পুরো রাতটাই জেগে কাটালাম। মনের মধ্যে হাসান নামের ছেলেটির জন্য অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করছি। চোখে ভাসছে ওর নিষ্পাপ চেহারা, ভেজা চোখ। দুঃসহ স্মৃতি। কী করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলাম না। শেষে ভাবলাম, আগে মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করি। তারপর যা হয়, দেখা যাবে। ঠিক করলাম আগামীকাল রাতে ওঁনাকে আমার সাথে খেতে বলব।

মাওলানা সাহেবের নাম ইরতাজ উদ্দিন আহমেদ। ছোটখাট গড়নের মানুষ। আলগা একটা গাম্ভীর্য সবসময় মুখে লেগে থাকে। দেখে মনে হয় রেগে আছেন। সেদিন দেখে যতটা বয়স্ক মনে হয়েছিল, আজ তার চেয়ে কম বয়স্ক মনে হচ্ছে। উনি চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। চোখে সুরমা দেওয়ার কারণেই বয়স কম মনে হচ্ছে কিনা কে জানে। চেহারাতেও কেমন একটা শিশুসুলভ ভাব চলে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে, স্কুলের কোন বাচ্চার মুখে অদ্ভুত উপায়ে হঠাৎ দাড়ি গজিয়ে গেছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁনাকে নিয়ে গল্পে বসলাম। উনি বললেন, 'আপনি বললেন আমার সাথে জরুরি কথা আছে। কিন্তু কী প্রসঙ্গে?' বললাম, 'আমার কথা আপনার কাছে পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। এজন্য ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।'

উনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমি অন্তত তা মনে করব না। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।'

'আপনি আত্মা বা ভূত বিশ্বাস করেন?'

'আত্মা অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে ভূত বিশ্বাস করি না। ভূত বলে জগতে কিছু নেই। কিন্তু জিন বলে একটি জাতি রয়েছে। যার বর্ণনা আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফে রয়েছে।'

'মাওলানা সাহেব, হাসান নামের ছেলেটির কথা তো আপনার নিশ্চয় মনে আছে, দু-দিন আগে যার ফাঁসি হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সে আমার সাথে এক অদ্ভুত উপায়ে যোগাযোগ করেছে। তার সাথে আমার কথাও হয়েছে। আসলে, তার কথাতেই আজ আপনাকে এখানে ডেকেছি। সে সম্ভবত আপনাকে কিছু বলতে চায়।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থামলাম। তাকিয়ে দেখি, মাওলানা সাহেবের মুখে বিরক্তির রেখা সুস্পষ্ট। উনি বললেন, 'দেখুন ডাক্তার সাহেব, আমি বিজ্ঞানের লোক না। কিন্তু তারপরও মনের দিক দিয়ে আমি পুরোপুরি বিজ্ঞানমনস্ক। আমি কোন কুসংস্কার বা আধিভৌতিক ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেই না।

কারণ আমি জানি এগুলোর বাস মনে। আত্মা অবশ্যই আছে, তবে সেগুলো যখন দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন তারা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে চলে যায়। তাদের পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করার কোন কারণই নেই। আপনি উচ্চ শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও এসব বিশ্বাস করেন। অবাক লাগছে।'

উনি বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকালেন। তারপর আবার বললেন, 'এটাই যদি আপনার একমাত্র জরুরি কথা হয়ে থাকে, তবে আমি রাত্রে আপনার এখানে থাকার কোন প্রয়োজন দেখছি না। বাসায় অনেক জরুরি কাজ ফেলে এসেছি। আজ রাতেই আমার মেয়ে এবং মেয়ে জামাই ময়মনসিংহ থেকে আসার কথা। তাদের আনতে স্টেশনে যেতে হত। তবু আপনার কথা ভেবে এখানেই এসেছি। কিন্তু এসব বলার জন্য ডেকেছেন ভাবিনি।'

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে, যা হওয়ার হোক। আমার আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না। যে কথাগুলো আমিই এতদিন অন্যদের বলে এসেছি, সে কথাগুলোই এখন অন্য একজনের মুখ থেকে আমাকে শুনতে হচ্ছে। এরচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে?

শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আপনি অন্তত আজ রাতটা আমার জন্য হলেও এখানে থাকুন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ।' আমার চেহারা দেখে সম্ভবত মাওলানা সাহেবের মায়া হলো। উনি মত পাল্টালেন। বললেন, 'ঠিক আছে, অনেক রাত হয়েছে। থেকেই যাই আপনার সঙ্গে। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো আপনার প্রেতাত্মার সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে।'

ওঁনার কণ্ঠের পরিহাসটুকু স্পষ্টই বুঝলাম। মনে মনে ভাবলাম, এতকিছুর পর যদি আজ কিছুই না ঘটে, তবে কালকেই সারা শহর জেনে যাবে আমার পাগলামির কথা।

উনি আমার অস্থিরতা লক্ষ করে বললেন, 'এমনও তো হতে পারে, কেউ আপনার সাথে রসিকতা করার চেষ্টা করছে।'

'নাহ্।' দুর্বল ভাবে মাথা নাড়লাম। 'আমি আমার ভেতর থেকে ওটার অস্তিত্ব অনুভব করি। আর তা ছাড়া আমার সাথে এরকম রসিকতা করার মত লোকও এই শহরে নেই।'

হঠাৎ ফোনের শব্দে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। গল্পে গল্পে কখন দুটো বেজে গিয়েছে খেয়ালই করিনি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এটাই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ফোন কল।

'শুনতে পাচ্ছেন? টেলিফোন···টেলিফোন বাজছে!' উত্তেজিত স্বরে বললাম।

'কই···আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আর শুনতে পেলেই বা কী? ফোন তো যে কোন সময় বাজতেই পারে···'

আমি ওঁনার কথা শোনার অপেক্ষা না করে, দুই লাফে বেড রুমে ঢুকেই রিসিভার কানে লাগালাম। 'হ্যালো?'

সেই চাপাস্বরে ফোঁপানি শুনতে পেলাম। বললাম, 'আমি ডাক্তার বলছি।

মাওলানা সাহেবও এখানেই আছেন। আমি চেষ্টা করছি উনি যেন তোমার সাথে কথা বলেন।'

এতক্ষণ অনেক শক্ত শক্ত কথা বললেও এই মুহূর্তে ওঁনাকে বেশ নার্ভাস মনে হলো। কোন কথা না বলে ধীর পায়ে এগিয়ে যেয়ে রিসিভার তুলে নিলেন। 'হ্যালো, কে?'

ওপাশ থেকে কী জবাব এল জানি না, কিন্তু লক্ষ করলাম ওঁনার চেহারা ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি···আমি চেষ্টা করব। জানি না কাজ হবে কিনা। কিন্তু আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।'

হতভম্ব হয়ে ফোন রেখে উনি চেয়ারে এসে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। তারপর যখন কথা বললেন, মনে হলো, বহুদূর থেকে ওঁনার কথা ভেসে আসছে।

'ডাক্তার সাহেব, এটা রসিকতা! স্রেফ রসিকতা!' দুর্বল ভঙ্গিতে বললেন উনি। 'আপনার মানসিক দুর্বলতার কথা জেনে, কেউ এই ভয়ংকর রসিকতা করছে।'

'কিন্তু আপনি কথা বলার সময় নিশ্চয় ওটার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন?' বললাম আমি। 'আমি জানি আপনি তা অস্বীকার করতে পারবেন না। এটা কোন মানুষের কাজ না।'

মাওলানা সাহেব আর কোন কথা বললেন না। অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বসে রইলেন চেয়ারে। তাঁর হতভম্ব ভাবটা এখনও কাটেনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'ওর হয়ে আল্লাহর কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে বলছে। ও মৃত্যুর পর বুঝতে পারছে মেয়েটার নাকি আসলে কোন দোষ ছিল না। শুধু শুধুই ওকে খুন করেছে। এখন ক্ষমা না পেলে ওর আত্মা মুক্তি পাবে না। এই জেলখানার ভিতরেই কষ্ট পাবে। কিন্তু এটা অসম্ভব···একেবারেই অসম্ভব।'

'কী অসম্ভব?' সব বুঝতে পেরেও বোকার মত প্রশ্ন করলাম।

'ওর কথা বলাটা। একজন মৃত মানুষ কখনোই কথা বলতে পারে না।'

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

'আমি ওর আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করব,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন উনি। 'পুরো ব্যাপারটা সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, বা কল্পনাই হোক, কিছু যায় আসে না। কারও আত্মার জন্যে প্রার্থনা করাটা দোষের কিছু নয়।'

সেই ভয়াবহ রাতটা আমরা জেগেই কাটিয়েছিলাম। ফজরের আযান দেওয়ার সাথে সাথে মাওলানা সাহেব বিদায় নিয়েছিলেন আমার বাসা থেকে। হাসানের জন্য উনি দোয়াও নিশ্চয় করেছিলেন। কারণ জেল কম্পাউন্ডের ভিতর আমি আর কখনোই কোন রকম অস্বস্তি অনুভব করিনি। কোনও অদ্ভুত ফোনও আর আসেনি। মনসুর আবার কাজে যোগ দিয়েছে।

মাওলানা সাহেবের সাথে এরপর অনেকবার আমার দেখা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, সেই রাতের ব্যাপারটা উনি আর কখনোই স্বীকার করেননি। উনি

বিশ্বাস করতেন, সেদিন আমরা দুজনেই মানসিকভাবে উত্তেজিত ছিলাম। সেজন্যই ওরকম হয়েছে। মাঝে মাঝে হেসে বলতেন, 'ডাক্তার সাহেব, সেদিন ভয়টা যা দেখিয়েছিলেন। ওফ!'

প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করত না। মাঝে মাঝে নিজের উপরেই সন্দেহ হয়। সেদিন আমি সত্যিই কি কিছু দেখেছিলাম বা শুনেছিলাম? নাকি আসলেই হ্যালুসিনেশন?'

হাসান হঠাৎই চুপ করে গেল। তার গল্প এখানেই শেষ হলো।

তারপর হেসে বলল, 'আমার জীবনের একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা তোকে বললাম। এখন যা শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে, আমাকেও ঘুমোতে দে।'

মনে কয়েকটা প্রশ্ন এসেছিল। কিন্তু রাত অনেক হয়েছে দেখে আর করলাম না। ভাবলাম, কাল সকালে জিজ্ঞেস করলেও চলবে।

ওকে ওর ঘর দেখিয়ে দিয়ে, সবকিছু ঠিকঠাক করে দিলাম। তারপর বিদায় নেওয়ার আগে হঠাৎ ও ডাক দিল আমাকে। করুণ স্বরে বলল, 'দোস্ত, তোর মনে যদি কখনও কোন কারণে আঘাত দিয়ে থাকি, মাফ করে দিস। কিছু মনে রাখিস না।'

ভীষণ অবাক হলাম। এরকম একটা মুহূর্তে ও হঠাৎ এরকম কোন কথা বলতে পারে চিন্তাই করিনি। ওর পাশে যেয়ে বসলাম। বললাম, 'তোর কী হয়েছে বল তো? আসার পর থেকেই তোকে বিষণ্ণ দেখছি। আবার এখন এরকম একটা কথা বললি?'

'না। এমনিতেই…হঠাৎ ইচ্ছা হলো।'

'তোর ওপর আমার কোন রাগ নেই। সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের উপর কখনও রাগ করা যায় না। অভিমান হয় বড়জোর।'

'থ্যাংকস!' মৃদু হাসল হাসান। তারপর সম্ভবত কথা কাটানোর জন্যই বলল, 'আমার কিন্তু একটা বদঅভ্যেস আছে। সকাল ৭টায় আমার এক কাপ চা খেতে হয়। তোদের দারোয়ানকে বলে রাখবি যেন গেট খুলে দেয়।'

আমি বললাম, 'তোকে বাইরে কোথাও যেতে হবে না। রুবা খুব ভোরে ওঠে। ওকে বলে রাখব। যথাসময়ে তোর চা পেয়ে যাবি।'

'তা হলে তো ভালই।' মৃদু হেসে মাথার নীচে হাত রেখে শুয়ে পড়ল।

আমিও আর দেরি করলাম না। ওকে বিদায় জানিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলাম। যাওয়ার সময় গিল্টু মিয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, ব্যাটা আজ ঠিকঠাক মতই মশারি খাটিয়ে শুয়েছে। এটা ওর অভ্যেসের বাইরে। প্রতিদিনই হয় আমাকে, না হয় রুবাকে চেঁচামেচি করতে হয় ওর মশারি খাটানো নিয়ে। ঘরে ঢুকে রুবার পাশে শুয়ে পড়লাম। ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাসানের চায়ের কথা বলে বেডসাইড টেবিলে একটা স্লিপ লিখে রাখলাম।

সকালে রুবার ধাক্কা-ধাক্কিতে ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখি ও ফ্যাকাসে মুখে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোনমতে বলল, হাসান ভাই রুমে নেই। আড়মোড়া

ভেঙে উঠে বসলাম। রুবা বেশিরভাগ সময়ই অযথা ভয় পায়। দড়ি দেখলেই সাপ মনে করা গোত্রের মানুষ ও। কাজেই খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না। বললাম, 'আছে হয়তো বাথরুমে। ওর আবার ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে।'

'না। আমি পুরো বাড়ি খুঁজে শিওর হয়েই তোমাকে উঠিয়েছি।'

এইবার মনে হলো, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখা দরকার।

সকাল ৯টার মধ্যেই নিশ্চিত হলাম, ও যে শুধু আমার বাসায় নেই তাই নয়, বরং এই অ্যাপার্টমেন্টেই নেই। গরু খোঁজা বলতে যা বোঝায় আক্ষরিক অর্থে তাই করলাম। মনে হচ্ছে মানুষটা রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেছে। বাড়ির দারোয়ান বলল, সে কাল রাতে অপরিচিত কাউকে বাসায় ঢুকতে দেখেনি। আজ সকালেও কাউকে বেরোতে দেখেনি। পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। ওর হোটেলের নাম্বারে ফোন করে জানলাম, ওখানে একজনই হাসান আছে। তবে সে রুমেই আছে। এই হাসান নয়। তবে কি হাসান কোন কারণে মিথ্যে বলেছে? অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশের হাত থেকে?

দুপুর ২টার দিকে হয়রান হয়ে বাসায় ফিরলাম। দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা হয়েছে। একটা মানুষ না বলে-কয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে যেতে পারে, আমার মাথায় আসছে না। পুলিশে খবর দেব কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু সমস্যা হলো ২৪ ঘণ্টা পার না হলে, পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসাবে গণ্য করে না। আর তা ছাড়া পুলিশ এলে আরও ঝামেলায় পড়ব বলে আমার ধারণা। হয়তো আমাদেরকেই উল্টো সন্দেহ করে বসবে।

হাসান নিখোঁজ হওয়ার পর ১০-১২ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এখনও কোন কিছুর সুরাহা হয়নি। রুবা আমার সামনে শুকনো মুখে বসে আছে। হাসানের ব্রিফকেস লক করা। না হলে ওটা ঘেঁটে দেখা যেত, কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিছুই বুঝতে পারছি না কী করব।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম সিলেট যাব। এমনও হতে পারে রাতে জরুরি কোন ফোন পেয়ে ওর মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে হুট করে চলে গেছে। অবশ্য যুক্তিটা আমার নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হচ্ছে।

আমার সিলেট যাওয়া রুবা কিছুতেই মেনে নিচ্ছে না। ওর ধারণা, ওখানে গেলে আমি আরও বড় কোন ঝামেলায় পড়ব। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালাম। ঠিক হলো, আমার সিলেট যাওয়ার পর যদি হাসান চলে আসে, তবে রুবা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে। আমার শাশুড়ী অর্থাৎ রুবার মাকে বললাম কিছু দিন আমার বাসায় থাকার জন্য। আর দেরি না করে সেদিন রাতের ট্রেনেই সিলেট রওনা হলাম।

পরদিন খুব ভোরবেলায় সিলেটে পৌঁছালাম। হোটেলে আগে থেকেই সিট বুক করা ছিল। ওখানে যেয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম। তারপর সকাল ৯ টার দিকে গোসল এবং নাস্তা সেরে বের হলাম।

ঠিক করলাম, প্রথমেই জেলখানায় যেয়ে জেলারের সাথে দেখা করে ওর

বাসার ঠিকানা নেব। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো ওর অফিসেই ওকে পেয়ে যেতে পারি। যদিও ভালমতই জানি যে সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বুঝলাম যে আমি আসলে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি।

অনেক ঝামেলা করে জেলের ভিতরে ঢুকে জেলারের সাথে দেখা করার অনুমতি পেলাম। যদিও পরে মনে হয়েছে যে দেখা না পেলেই ভাল হত। কেন একথা বললাম? বলছি…

জেলার সাহেব আমাকে দেখে বললেন, 'আরে, আপনি! কী খবর?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আমাকে চেনেন আপনি?'

এবার উনি বিস্মিত হলেন। তারপর হঠাৎ হেসে ফেললেন। বললেন, 'আমার স্মৃতি শক্তি এতটা খারাপ নয় যে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাকে ভুলে যাব। আপনি বসুন।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। জীবনে এই প্রথম সিলেটে এসেছি। কিন্তু এই ভদ্রলোক তো মনে হচ্ছে আমাকে চেনেন। ব্যাপারটা আসলে কী ঘটছে আমার জানা দরকার। কিন্তু সবকিছু সত্যি বললে তো এই ভদ্রলোক আমাকে পাগল ঠাওরাবেন। চট করে কোন বুদ্ধি বের করা দরকার। বললাম, 'আসলে কিছু মনে করবেন না। আমি সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় আগের কিছু স্মৃতি হারিয়েছি। ডাক্তারের পরামর্শে আমি যেসব জায়গায় গিয়েছি, আবার সেসব জায়গায় যাচ্ছি। যদি ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যায়, এই আশায়।'

'ও…আই সি!' উনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'কীভাবে ঘটেছে দুর্ঘটনা?'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। গুছিয়ে মিথ্যা বলা খুব কঠিন কাজ। বিশেষত পুলিশের লোকের সামনে। বললাম, 'কীভাবে ঘটেছে এটাও মনে নেই। তবে যেটুকু শুনেছি তা হলো, অফিস থেকে ট্যুরে যাচ্ছিলাম। পথে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে। তাতে আমি মাথায় আঘাত পাই।'

'আমার কথা আপনার মনে নেই, অথচ সিলেটে যে এসেছিলেন সেটা মনে আছে। জেলখানার কথাও মনে আছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম। উনি কি বুঝে ফেলেছেন যে আমি মিথ্যে কথা বলছি? বললাম, 'আসলে ছাড়া ছাড়া ভাবে কিছু দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে। তা থেকেই বাকিটা আন্দাজ করে নেই। আপনার হাতে যদি সময় থাকে তো আমাকে সবকিছু খুলে বলুন, প্লিজ। কোথায় আমাকে দেখেছিলেন, কীভাবে পরিচয় হয়েছিল…সবকিছু। আমার উপকার হবে।'

উনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'চা খাবেন? চা দিতে বলি?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই আর্দালিকে চায়ের অর্ডার দিলেন।

'…আপনি আমার এখানে প্রথম এসেছিলেন একটি লাশ হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ করতে,' উনি বলতে শুরু করলেন।

'লাশ হস্তান্তর!!!' চেষ্টা করেও বিস্ময় লুকোতে পারলাম না।

'হ্যাঁ…হাসান নামের এক মেডিকেল ছাত্রের লাশ। ছেলেটি তারই এক ক্লাসমেটকে খুন করেছিল। সেজন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আমাদের জানা মতে ছেলেটির কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। ফাঁসি কার্যকর করার পর আমরা ঠিক করেছিলাম যে জেলখানার তত্ত্বাবধানেই ওর দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। ঠিক এরকম সময়ে আপনি আমাদের এখানে এলেন। লাশের দায়িত্ব নিতে চাইলেন। আমাদেরকে একটি ছবি দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে ওই ছেলেটি আপনার কলেজ জীবনের বন্ধু ছিল। আমরাও আপত্তি করার কোন কারণ দেখলাম না। তারপর আপনি লাশ নিয়ে চলে গেলেন। ওর জিনিসপত্র এবং কিছু ব্যক্তিগত জিনিসও একটা ব্রিফকেসে ভরে আপনাকেই দেয়া হয়েছিল। ঘটনা এই পর্যন্তই।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে, উনি তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। 'কিছু মনে পড়েছে?'

হঠাৎ বুঝতে পারলাম, ভয়ে আমি ঘেমে উঠেছি। ভয়ংকর এক সম্ভাবনার কথা উঁকি দিচ্ছে মনে। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই ছবিটা কি আপনার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। প্রমাণস্বরূপ রেখে দিয়েছি। দেখতে চান?'

গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। মাথা ঝাঁকালাম।

উনি আর্দালিকে দিয়ে একটি ফাইল আনালেন। সেই ফাইল থেকে একটা ছবি বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আমি বরফের মত জমে গেলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। এটা আমারই কলেজ লাইফে তোলা পিকনিকের একটা গ্রুপ ছবি।

জেলার সাহেব বললেন, 'একেবারে বাম থেকে দ্বিতীয় ছেলেটিই আপনার বন্ধু হাসান। যার ফাঁসি হয়েছে। চিনতে পারছেন?'

আমি কোন কথা বললাম না। চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। সেই হাসান, যে পরশু রাতেই আমার বাসায় আমার সাথে গল্প করেছে। যার সাথে স্কুল এবং কলেজ জীবনের এতগুলো বছর পার করেছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি নিশ্চিত যে এই ছেলেরই ফাঁসি হয়েছে?' বলেই অবশ্য বুঝলাম, প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল।

আমার কথায় উনি হাসলেন। বললেন, আমাদের এই জেলখানাতেই ফাঁসি হয়েছে আর আমরা জানব না? বুঝতে পারছি, আপনি আসলে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু কী করবেন বলুন, ভাগ্যের উপর তো কারও হাত নেই।'

ঢাকায় ফিরলাম গায়ে একশো তিন জ্বর নিয়ে। রুবা আমার অবস্থা দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে গেল। পুরো দুটো দিন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ ছিলাম। তিনদিনের দিন থেকে জ্বর নামতে আরম্ভ করল। রুবার সেবা শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই বিভীষিকার কথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। রুবাকে অবশ্য সিলেটের ঘটনা কিছুই বলিনি। জানতে চেয়েছিল, শুধু বলেছি যে ওকে খুঁজে পাইনি।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা। রুবা কিছু কেনাকাটার জন্য গিল্টুকে নিয়ে বাইরে গেছে। হাসানের ব্রিফকেসটা ওরকমই খাটের নীচে পড়ে আছে। আস্তে করে ওটা টেনে বের করলাম। তারপর প্লায়ার্স আর স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লক ভেঙে ফেললাম। ভিতরে ওর কিছু কাপড়-চোপড়, একটা নোটবুক, হাতঘড়ি, দামী কিছু বিদেশী কলম আর মেডিকেল কলেজের কিছু কাগজপত্র রয়েছে। নোট বুক ভর্তি ছোট ছোট কবিতা লেখা। সবগুলোই পিয়াল নামের এক মেয়েকে উৎসর্গ করা হয়েছে। সবশেষে একটি ছবি...একটি মেয়ের ছবি। অপূর্ব সুন্দর একটি মায়াবী মুখ। এত সুন্দর যে শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ছবিটার অপর পৃষ্ঠায় লেখা 'পিয়াল'। আজ থেকে চার মাস আগের একটা তারিখ লেখা। আর সব শেষে ইংরেজিতে লেখা, I love you, Pial। ছবিটি সোজা করে তাকিয়ে থাকলাম, অপূর্ব সুন্দর মুখটির দিকে। হঠাৎ ছবিটি জীবন্ত মনে হলো। মনে হলো, মেয়েটি কিছু বলতে চায়। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে কিছু বলছে না।

(বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)
তানভীর আহমেদ

অশরীরী আতঙ্ক

কোন আলোচনাই তেমন জমছে না, অতিথিরা যে যার বাসায় ফেরার পাঁয়তারা করছে, এমনি সময় মুখ খুলল ব্রিসবেন। মুহূর্তে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল সে।

ব্রিসবেনের বয়স পঁয়ত্রিশের আশপাশে, দেহখানা দশাসই। শক্তিশালী ঘাড়ে ছোট আকারের মাথা, পেশল দু'হাত আর চওড়া বুক।

'খুব অদ্ভুত ব্যাপারই বটে,' বলল ও।

সবার কথা থেমে গেল। ছুরির মত কেটে বসেছে ওর কণ্ঠ।

'ব্যাপারটা বড়ই আজব,' কথার খেই ধরে সে। 'মানে ভূতের কথা বলছিলাম। আমি ভূত দেখেছি।'

চারপাশ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তবে জম্পেশ গল্পের আশাতেও উন্মুখ হয়ে উঠল অনেকে।

'প্রায়ই আটলান্টিক পাড়ি দিতে হয় আমাকে,' বলে চলল সে। 'নির্বিঘ্নে প্রতিবার ভ্রমণ সারতে পেরেছি, কেবল একবার বাদে। *কামটসচাটকা* জাহাজের নিয়মিত যাত্রী ছিলাম আমি। কিন্তু জীবনেও আর ওটাতে চাপব না, এমনই শিক্ষা হয়েছে। সে যাক, সেবার জাহাজে ওঠার পর লাল নাকঅলা এক স্টুয়ার্ডের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লাম।

'একশো পাঁচ, লোয়ার বার্থ,' নিয়মিত যাত্রীসুলভ গলায় বললাম। লোকটা আমার ব্যাগ আর গ্রেট-কোট তুলে নিল। ওর মুখের চেহারার অভিব্যক্তি কোনদিন ভুলব না আমি। ভয় পেয়ে গেলাম, হাত থেকে ব্যাগটা না ফেলে দেয়। চমৎকার দু'বোতল হুইস্কি ছিল ওর ভেতর। কিন্তু সে যাত্রা বাঁচা গেল যা হোক। সহি-সালামতে আমার কেবিনে ও পৌঁছে দিল মাল-পত্র। কেবিনটা নীচের দিকে, জাহাজের পেছনটায় পড়েছে। একশো পাঁচ। অতি সাধারণ এক কেবিন। আর সব বার্থের মত এটার লোয়ার বার্থটাও ডাবল। জায়গার অভাব নেই। ওয়াশিং প্লেস, টুথ ব্রাশ ঝোলানোর জন্যে বেকায়দা জায়গার ব্যবস্থাও আছে। ঘরে তোয়ালে দেখা গেল না, বাদামী রঙা এক ধরনের তরলে ভর্তি বেশ কটা শিশি দেখতে পেলাম। গন্ধটা ভাল লাগল না আমার।

স্টুয়ার্ড লটবহর নামিয়ে রেখে এমনভাবে আমার দিকে চাইল যেন পালাতে পারলে বাঁচে। এদের সাথে খাতির রাখা ভাল, কাজেই দ্বিধা না করে তখুনি কয়েকখানা কয়েন গুঁজে দিলাম ওর হাতে।

'আমি আমার সাধ্যমত আপনার দিকে খেয়াল রাখার চেষ্টা করব,' বলে পয়সাগুলো পকেটস্থ করল লোকটা। ওর কণ্ঠের ইতস্তত ভাবটা অবাক করল আমাকে। বকশিশ কম হয়ে গেছে নাকি? হয়তো খুশি হয়নি। অবশ্য আমার এ-ও মনে হলো, ঈষৎ পানাসক্ত লোকটা। তখন বুঝিনি ওর প্রতি অবিচার করছি আমি, ভুল করছি।

দুই

সেদিন উল্লেখ করার মত তেমন কিছু ঘটল না। যথাসময়ে ছাড়ল জাহাজ, আবহাওয়া মনোরম–ফলে খুশি-খুশি হয়ে উঠল মনটা। সাগরে প্রথম দিনটা কেমন কাটে জানা আছে সবার। লোকে ঘুরেফিরে সহযাত্রীদের লক্ষ করে। মাঝে মাঝে পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। খাবারের মান নিয়ে সংশয় থাকে প্রথমদিকে, তবে দু'এক বেলা খাওয়ার পর কেটে যায় সন্দেহ।

ভ্রমণের প্রথম রাতে আলস্যি বোধ করছিলাম আমি। একটু তাড়াতাড়িই সেদিন কেবিনে ফিরলাম। ঢুকে দেখি একজন সঙ্গী রয়েছে আমার। আমারটার মতই একটা ব্যাগ এক কোণে রাখা, এবং আপার বার্থে একখানা ছড়ি। খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লাম। একা থাকার ইচ্ছে ছিল। যাকগে, কার সাথে থাকছি দেখতে হচ্ছে।

বিছানায় যাওয়ার একটু পরেই কেবিনে ঢুকল সে। লম্বা-পাতলা এক লোক, ধূসর চোখ, হলদেটে চুল। না, এর সাথে পরিচিত হওয়ার কোন শখ নেই আমার। প্রথম দর্শনে পছন্দ হয়নি, একে এড়িয়ে চলব। বেচারা! ওর ব্যাপারে

অত সব সিদ্ধান্ত নেয়ার আসলে কোন দরকার ছিল না, কেননা প্রথম রাতের পর তাকে আর দেখিনি আমি।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, এ সময় জোরাল এক শব্দে জেগে উঠলাম আমি। কটা বাজে জানি না। মনে হলো, আমার সহযাত্রী আপার বার্থ থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়েছে। দরজা খোলার চেষ্টা করছে টের পেলাম; খুললও ওটা, পরমুহূর্তে প্যাসেজে শোনা গেল ওর ছুটন্ত পদশব্দ। পেছনে খোলা রইল দরজা। জাহাজ এখন খানিকটা টালমাটাল, ভাবলাম এই বুঝি ওর পতনের আওয়াজ পাব। জাহাজের তালে তালে দুলছে খোলা দরজাটা। লোকটা জান-প্রাণ নিয়ে পালাল কোথায়? বিছানা ছেড়ে উঠে লাগিয়ে দিলাম দরজা। তারপর দিলাম ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, কারণ যখন সজাগ হলাম তখনও আঁধার রয়েছে। বিশ্রী এক ধরনের ঠাণ্ডা অনুভব করলাম সহসা, বাতাসটা মনে হলো স্যাঁতসেঁতে। এ আর কিছু না, সাগরের পানির গন্ধ। ভাল মত কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম আবার। সকালে কঠোর ভাষায় অভিযোগ জানাতে হবে।

আপার বার্থে ফিরে এসেছে আমার সঙ্গী, নড়াচড়ায় বোঝা গেল। আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন হয়তো ফিরেছে। লোকটা গুঙিয়ে উঠল মনে হলো। সি-সিকনেস হতে পারে। লোয়ার বার্থের যাত্রীর কাছে ভাবনাটা ভাল লাগার কথা নয়। যাকগে, ভোরের আলো ফুটলে পরে ঘুম ভাঙল আমার।

ভীষণভাবে দুলছে এখন জাহাজটা। পোর্টহোল গলে চুইয়ে ঢোকা আলো বারবার বদলে যাচ্ছে, জাহাজের পার্শ্বদেশ যখনই সাগরের কিংবা আকাশের মুখোমুখি হচ্ছে। জুন মাসের তুলনায় ঠাণ্ডাটা বড্ড বেশি। ঘাড় কাত করে পোর্টহোলের দিকে চাইলাম। অবাক কাণ্ড! হা-হা করছে ওটা। ভয়ানক রাগ হলো। উঠে গিয়ে লাগিয়ে এলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ রাখলাম আপার বার্থে। পর্দাগুলো ঘন করে টানা, ওই লোকেরও সম্ভবত আমার মতই শীত করছে। ঘরটায় কেন জানি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না, রাতের ভেজা গন্ধটা টের পেলাম না যদিও।

আমার সঙ্গী এখনও ঘুমাচ্ছে। তাকে এড়ানোর এই সুযোগ–কাজেই তখুনি কাপড় পরে বেরিয়ে গেলাম। সাতটা বাজে। বায়ু সেবন করছিল জাহাজের ডাক্তার, দেখা হলো তার সাথে। বিশালদেহী লোক সে, পশ্চিম আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছে। কুশল বিনিময় করলাম। কাল রাতে পোর্টহোল খোলা পেয়েছি জানালাম তাকে। এ-ও বললাম, শুতে যখন গেছি তখন বন্ধ দেখেছিলাম। ঘরের ভেতরকার ভেজা-ভেজা ভাবটার কথা জানাতেও ভুল করলাম না।

'ভেজা!' বলে উঠল সে। 'কোথায় বলুন তো?'

'একশো পাঁচে–'

আঁতকে উঠল ডাক্তার, অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

'কী ব্যাপার?'

'না, কিছু না,' বলল সে। 'গত তিন ট্রিপে সবাই রুমটার ব্যাপারে অভিযোগ

করেছে।'

'আমিও করব,' বললাম। 'ঘরটা ভয়ানক স্যাঁতসেঁতে।'

'অভিযোগ করে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না,' বলল ডাক্তার। 'আমার ধারণা ওখানে খারাপ কিছু একটা আছে। যাকগে, কাউকে ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়।'

'ভয় আমি পাচ্ছিও না। ঠাণ্ডা লেগে গেলে আপনি তো আছেনই, ওষুধ দিয়ে দেবেন।'

'ভেজা আবহাওয়ার কথা বলছি না। সঙ্গে কি আর কেউ আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর এক লোক–রাতের বেলা দরজা খোলা রেখে, দুদ্দাড় করে বেরিয়ে চলে যায়।'

ডাক্তার আবারও কৌতূহলী চোখে আমার দিকে চাইল। তবে এবারে তাকে গম্ভীর দেখাল।

'সে কি ফিরে এসেছে?'

জানালাম যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন ফিরেছে। নড়াচড়ার শব্দ পেয়েছি, এক পর্যায়ে ঠাণ্ডা লেগে উঠতে সেঁটে ঘুম দিই। আজ সকালে দেখি পোর্টহোল খোলা।

'শুনুন,' বলল ডাক্তার। 'এক কাজ করুন, আমার ঘরে প্রচুর জায়গা আছে, আপনি চলে আসুন। আপনাকে যদিও চিনি না, তবু আপনার সাথে ঘর শেয়ার করতে আপত্তি নেই আমার।'

অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ কী হলো যে আমার প্রতি এত আগ্রহ দেখাচ্ছে ডাক্তার?

'আপনার অফারের জন্যে ধন্যবাদ,' বললাম। 'কিন্তু আমার মনে হয় পরিষ্কার করলেই ঘরটা ঠিক হয়ে যাবে।'

'দেখুন, আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না,' বলল ডাক্তার। 'আপনাকে ভয় দেখাতেও চাইছি না। কিন্তু আমার পরামর্শটা নিন, ও ঘর ছেড়ে আমার কেবিনে চলে আসুন।'

'কিন্তু কেন?' জবাব চাই আমি।

'কারণ, গত তিন ট্রিপে যারাই একশো পাঁচে শুয়েছে, সোজা সাগরে গিয়ে পড়েছে,' জানাল সে।

ডাক্তার ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম। না, সে রীতিমত সিরিয়াস। তার প্রস্তাবের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম এবং বললাম, আমি ও ঘরেই শোব। নিশ্চয়তা দিলাম, সাগরে পাওয়া যাবে না আমাকে।

নাস্তা করতে গেলাম আমরা। অল্প ক'জন মাত্র হাজির ওখানে। দু'একজন অফিসার আমাদের সাথে বসেছে, গোমড়া দেখলাম তাদের মুখ-চোখ। খাওয়া সেরে ঘরে গেলাম একটা বই আনার জন্যে। আপার বার্থের পর্দা দেখলাম তেমনি টানা। কোন সাড়া-শব্দ নেই। আমার সহযাত্রী সম্ভবত এখনও ঘুমাচ্ছে।

বেরিয়ে আসতে স্টুয়ার্ডের সাথে দেখা হলো। ফিসফিস করে জানাল, ক্যাপ্টেন আমার সাথে কথা বলতে চায়. তারপর আমার প্রশ্নের সম্মুখীন যাতে হতে না হয় তাই দৌড়ে পালাল। ক্যাপ্টেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'স্যার, আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাই,' বলল সে।

'আপনার ঘরে যে ভদ্রলোক শুয়েছিলেন,' বলল ক্যাপ্টেন, 'তিনি উধাও হয়ে গেছেন। আপনার চোখে কি রাতে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েছে?'

একটু আগে ডাক্তারের সাথে কথা হলো, এখন আবার ক্যাপ্টেনের এহেন অদ্ভুত প্রশ্ন, বিস্মিত করে ছাড়ল আমাকে।

'সে লোক সাগরে পড়ে গেছে বলছেন না তো?'

'আমার ধারণা তাই ঘটেছে।'

'তারমানে এই নিয়ে চারজন,' বললাম।

'মানে?'

ডাক্তারের কাছে যা শুনেছি, একশো পাঁচের বদনাম সম্পর্কে, জানালাম ক্যাপ্টেনকে। বিরক্ত হলো সে, আমি জানি দেখে।

'এই একই কথা অন্যদের সহযাত্রীরাও বলেছে। লোকেরা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দেয় প্যাসেজ ধরে। দু'জনকে দেখা গেছে সাগরে পড়তে: আমরা জাহাজ থামিয়ে নৌকা নামিয়েছি, কিন্তু তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। আপনার সাথের লোকটার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটল। স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে। স্টুয়ার্ড কিছু একটা গড়বড় আঁচ করতে পেরে সকালে তার খবর নিতে যায়। গিয়ে দেখে বার্থ খালি। কাপড়-চোপড় পরে আছে। স্টুয়ার্ড সারা জাহাজে তাকে অনেক খুঁজেছে কিন্তু কোথাও পায়নি। এখন আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, দয়া করে যাত্রীদের কথাটা জানাবেন না। জাহাজের বদনাম হয়ে গেলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। আর আপনার যে রূম পছন্দ বেছে নিতে পারেন, এমনকী আমারটাও। আমি কি আশা করতে পারি আপনি আমার কথা রাখবেন?'

'অবশ্যই,' বললাম। 'তবে একা থাকার সুযোগ যখন পেয়েছি ও ঘরেই থাকব। স্টুয়ার্ডকে বলুন হতভাগ্য লোকটির জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে যাক। আর ভয় পাবেন না, আমি আমার সঙ্গীকে ফলো করব না।'

অনেক ওজর-আপত্তি তুলল ক্যাপ্টেন, কিন্তু আমি কান দিলাম না। কাজটা বোকামি করেছিলাম কিনা জানি না, তবে তার কথায় কান দিলে আজ আর অভিজ্ঞতাটা আপনাদের জানাতে পারতাম না।

ক্যাপ্টেনকে বললাম, কেবিনটা অপরিষ্কার এবং রাতে পোর্টহোল খোলা ছিল। আমার সহযাত্রী খুব সম্ভব অসুস্থ ছিল, শোয়ার পর হয়তো বা জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমার ধারণা, এখনও সে জাহাজেরই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে, একটা সময় পাওয়া তাকে যাবেই। ক্যাপ্টেন আবারও আমাকে একশো পাঁচ ত্যাগ করতে অনুরোধ করল, কিন্তু আমি গায়ে মাখলাম না।

সেদিন সন্ধেয় দেখা হলো ডাক্তারের সাথে। আমি মত পাল্টেছি কিনা জানতে চাইল। জানালাম পাল্টাইনি।

'খুব শিগ্‌গিরই পাল্টাবেন,' থমথমে কণ্ঠে বলল সে।

তিন

সন্ধেয় তাস খেললাম আমরা, ঘুমাতে গেলাম দেরি করে। বলতে দ্বিধা নেই, ঘরে ঢোকার পর কেমন অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। সহযাত্রীটির কথা ভুলতে পারছি না, বেচারা সম্ভবত বেঘোরে জানটা খোয়াল। ওর দেহকাঠামো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মানসচক্ষে। দরজা লাগিয়ে দিলাম। হঠাৎই খেয়াল করলাম পোর্টহোল খোলা। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। রবার্ট, অর্থাৎ আমার স্টুয়ার্ডের খোঁজে বেরোলাম। ওকে খুঁজে পেয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলাম একশো পাঁচের দরজার কাছে, তারপর ঠেলে দিলাম খোলা পোর্টহোলের দিকে।

'পেয়েছটা কী তুমি?' গর্জন ছাড়লাম। 'জানো না, পোর্টহোল খোলা রাখা নিষেধ? পানি একবার হড়হড় করে ঢুকতে শুরু করলে, দশজন মিলেও দরজা বন্ধ করা যাবে না, নতুন করে শেখাতে হবে তোমাকে? আমি ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করব।'

ভীষণ রেগে গেছি আমি। লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁচের গোল প্লেটটা ভারী স্ক্রু দিয়ে লাগাতে আরম্ভ করল।

'কী, কথার জবাব দিচ্ছ না যে?' কর্কশ গলায় জবাব চাইলাম।

'স্যার,' নম্র কণ্ঠে বলল রবার্ট, 'কারও সাধ্য নেই রাতের বেলা এই পোর্ট বন্ধ রাখে। আপনি নিজেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমি মরে গেলেও এ জাহাজে আর থাকছি না। আপনি, স্যার, অন্য কোথাও ঘুমালে ভাল করতেন। এবার পরখ করে দেখুন, ঠিকমত লেগেছে কিনা।'

পরীক্ষা করলাম। এক ইঞ্চি নড়ানোর সাধ্য হলো না।

'ঠিক আধ ঘণ্টা পর দেখবেন, স্যার, আপনাআপনি খুলে বসে আছে, এবং হুড়কো লাগানো! ওটাই বেশি ভয়ের–খোলা অবস্থায় হুড়কো আটকানো! দেখে মনে হবে কেউ বুঝি ইচ্ছে করে কাজটা করেছে।'

প্রকাণ্ড স্ক্রুটা পরখ করলাম আমি।

'রাতে এটা খোলা পেলে তোমাকে একটা পাউন্ড দেব, রবার্ট। তুমি এখন যেতে পারো।'

'এক পাউন্ড, স্যার? ধন্যবাদ, স্যার, আসি।'

বিছানায় গেলাম আমি, এবং রবার্ট দরজার কাছের আলোটা নিভিয়ে দিল। আঁধারে চুপচাপ শুয়ে আছি তো আছিই, ঘুম আর আসে না। মাঝে মাঝেই চোখ

চলে যাচ্ছে পোর্টহোলের দিকে, শুয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছি ওটা। ঘণ্টাখানেক কেটেছে, চোখ লেগে এসেছে প্রায়, এমনি সময় হিমশীতল বাতাসের ঝাপ্টায় ঘুমটা গেল চটকে। মুখের ওপর ক'ফোঁটা সাগরের নোনা পানি পড়তে, তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম; কিন্তু জাহাজের দুলুনি কামরার ওপাশে ছিটকে ফেলে দিল আমাকে। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসলাম। হা-হা করছে পোর্টহোল, খোলার পর ওটাকে পেছনে আটকে রেখেছে কেউ।

এ ঘটনা তো আমার স্বচক্ষে দেখা। ঘুম ভেঙে গেছিল আমার, তা ছাড়া যে আছাড় খেয়েছি, তাতে ঘুমের লেশমাত্রও থাকার কথা নয়। পরদিন শরীরে কালশিটে দেখে আরও নিশ্চিত হলাম। ভয় তো লেগেছেই, তার চেয়ে বেশি লেগেছে বিস্ময়ের ধাক্কা। তখুনি আবার পোর্টহোল লাগিয়ে কষে স্ক্রু মেরে দিলাম। কামরার ভেতর এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

পোর্টটা ফের পরীক্ষা করলাম। পিতলের স্ক্রুটা নড়ানো মুখের কথা নয়; এঞ্জিনের কাঁপুনির ফলে জিনিসটা খুলে গেছে–ভাবনাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম সাগরে চোখ রেখে। হুঁশ ফিরল প্রায় পনেরো মিনিট পর।

দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পেছনে কোন এক বার্থে নড়ে উঠল কী যেন, পরমুহূর্তে শুনতে পেলাম অস্ফুট এক শব্দ। পলকে ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটানে সরিয়ে দিলাম পর্দা। বার্থে হাত ভরে কী আছে দেখার চেষ্টা করলাম। কিছু একটা ছিল ওখানে।

মনে হলো ভেজা বাতাস বুঝি হাতড়াচ্ছি আমি। পর্দার ওপাশ থেকে নোনা পানির গন্ধ ধক করে নাকে এসে লাগল। মানুষের বাহু আকৃতির এক অবয়ব অনুভব করলাম, তবে জিনিসটা মসৃণ, ভেজা আর বরফশীতল। আমি হ্যাঁচকা টান দিতে আমার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অদ্ভুত প্রাণীটা। তার ভারী দেহের আঘাতে চিত হয়ে পড়ে গেলাম আমি, পরক্ষণে দরজা খুলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল জিনিসটা। ভয় পাওয়ারও সময় পেলাম না আমি, দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে ধাওয়া করলাম ওটাকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছি। দশ গজ সামনে দেখতে পেলাম–মানে নিশ্চিত দেখলাম–অন্ধকারাচ্ছন্ন প্যাসেজ ধরে কালো এক ছায়ামূর্তি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত, তারপর উধাও হয়ে গেল ওটা। ঘাড়ের কাছে খাড়া হয়ে গেল আমার চুল, মুখ বেয়ে গড়িয়ে নামল শীতল ঘাম। স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম সেদিন।

বহু কষ্টে কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম। গোটা ঘর সাগরের নোনা পানির গন্ধে ভরপুর। আপাদমস্তক শিউরে উঠল আরেকবার। আলো জ্বালতে দেখতে পেলাম, আবারও খুলে গেছে পোর্টহোল, আতঙ্কে কাঁপ উঠে গেল আমার। জীবনে কোনদিন এত ভয় পাইনি, ভবিষ্যতেও আর পেতে চাই না। আপার বার্থ পরখ করলাম। ভেবেছিলাম সাগরের পানি দিয়ে ভরে থাকবে, কিন্তু তা নয়। এ বিছানায় কেউ একজন শুয়েছিল, সাগরের ঘ্রাণও জোরদার; কিন্তু বেডক্লথ

শুকনো খটখটে। প্রথম রাতের ঘটনার পর রবার্ট মনে হয় বিছানা করার সাহস পায়নি। পর্দা যদ্দূর পারি সরিয়ে জায়গাটা সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলাম। একদম শুকনো। কিন্তু পোর্টহোল খোলা। হতবিহ্বল আমি ওটা বন্ধ করে স্ক্রু এঁটে দিলাম। এরপর ভারী এক লাঠি ব্যবহার করে সর্বশক্তিতে প্যাঁচ দিলাম স্ক্রুতে। ভারী ধাতব বাঁকা হতে আরম্ভ করলে তবে থামলাম। এবার বসে পড়লাম। বিশ্রামের প্রশ্নই ওঠে না–কিছু ভাবতেও পারছি না। পোর্টহোল বন্ধ রইল। আসুরিক শক্তি ছাড়া ওটা কেউ খুলতে পারবে বলে বিশ্বাস হলো না আমার।

শেষমেশ সকাল হলো। ধীরেসুস্থে পোশাক পরে, রাতের ঘটনাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। চমৎকার এক সকাল। খাঁটি রোদ গায়ে মাখতে পেরে, নীল সাগরের পানির ঘ্রাণ বুক ভরে টেনে, স্বস্তি বোধ করলাম। ও ঘরের গুমোট পরিবেশের সাথে কত অমিল এখানকার। দেখা হলো ডাক্তারের সঙ্গে। আমার চেহারা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। আমাকে ড্রিঙ্ক অফার করল। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গত রাতের কথা খুলে বললাম। স্বীকার করলাম, সে ঠিকই বলেছিল–অশুভ কিছু একটা আছে ওখানে।

রাতে দু'বার পোর্টহোল লাগিয়েও কাজ হয়নি শুনে মৃদু হাসল ডাক্তার। 'আপনাকে আবারও বলছি, মালপত্র নিয়ে আমার ঘরে চলে আসুন।'

'এক কাজ করুন না,' বললাম আমি। 'আপনিই বরং এক রাতের জন্যে আমার ওখানে আসুন। দু'জন মিলে রহস্যটার সমাধান করি।'

'ও ঘরে থাকলে সলিল সমাধি ঘটবে,' বলল ডাক্তার।

'আপনার কি ধারণা ওটা ভূত?' জানতে চাই আমি।

ঝট করে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল ডাক্তার।

'আর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন আপনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল। 'পারবেন না। ব্যাখ্যা থাকলে তো দেবেন।'

বিজ্ঞানের লোক হয়ে এ কেমন কথা বলছে ডাক্তার, প্রথমটায় ভাবলাম আমি, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, সত্যিই তো, কী ব্যাখ্যা এর?

মনে জেদ চেপে গেছে আমার। গত দু'রাতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর ও ঘরে অন্য কেউ হলে থাকতে চাইত না, কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, কেউ না থাকুক–আমি থাকব।

খানিক পরে ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা হলে, তাকে সব খুলে বললাম।

'আমি থাকব আপনার সাথে,' বলল সে। 'কী ঘটে দেখব। আমার বিশ্বাস, রহস্যটা আমরা ভেদ করতে পারব। কোন লোক হয়তো লুকিয়ে থাকে জাহাজে, যাত্রীদের ভয় দেখিয়ে জাহাজের বদনাম করতে চায়।'

ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। এক কর্মচারীকে ডেকে পাঠিয়ে, আমার যা যা লাগে দিতে বলে দিল সে। তখুনি নীচে নেমে এলাম আমরা। আপার বার্থ থেকে সমস্ত বেডিং-পত্র নামিয়ে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরখ

করলাম জায়গাটা, কোথাও কোন বোর্ড কিংবা দেয়ালের অংশবিশেষ আলগা রয়েছে কিনা। বলাবাহুল্য, তন্নতন্ন করে খুঁজেও তেমন ফাঁক পাওয়া গেল না। আমাদের কাজ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, এমনি সময় রবার্ট এসে উঁকি দিল।

'কিছু পেলেন, স্যার?' জানতে চাইল সে।

'পোর্টহোলের কথা তুমি ঠিকই বলেছিলে, রবার্ট,' বলে ওর প্রাপ্য টাকাটা গুঁজে দিলাম।

'আপনি এ ঘর ছাড়ুন, স্যার,' বলল ও। 'চারজন মানুষের জীবন গেছে–এখানে আর থাকবেন না দয়া করে।'

'আরেকটা রাত দেখতে চাই আমি,' বললাম।

চার

রাত দশটার দিকে ধূমপান করছি, এসময় এল ক্যাপ্টেন, এবং আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে।

'বিষয়টা গুরুতর, মি. ব্রিস্‌বেন,' বলল সে। 'মস্ত বিপদের আশঙ্কা আছে এতে। তাই আপনাকে একটা স্টেটমেন্টে সই করতে হবে। আর আজ রাতে কিছু যদি না ঘটে তবে কাল এবং পরশু রাতেও আমরা চেষ্টা করব। আপনার আপত্তি নেই তো?'

প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই নীচে গিয়ে ঘরটায় প্রবেশ করলাম আমরা। রবার্টের চোখের ভাষা পড়ে বুঝতে পারলাম, ভয়ঙ্কর কিছু একটার আশঙ্কা করছে সে। ক্যাপ্টেন দরজা লাগিয়ে তালা মেরে দিল।

'আপনার ব্যাগটা দরজার কাছে রাখা যাক,' পরামর্শ দিল সে। 'আমরা একজন বসে থাকব ওটার ওপর, যাতে ফাঁক গলে কেউ পালাতে না পারে। পোর্টে কি স্ক্রু মারা হয়েছে?'

সকালে পোর্টটা যেমন দেখেছি তেমনি পেলাম। বার-টার ব্যবহার করলে আলাদা কথা, এমনিতে কারও পক্ষে ওটা খোলা সম্ভব নয়। আপার বার্থের পর্দা সরিয়ে দিলাম, যাতে ভেতরটা ভাল করে দেখা যায়। ক্যাপ্টেন ব্যাগের ওপর বসে থেকে আমাকে বলল, ঘরটা ভাল মত চষে ফেলতে। কাজটা শীঘ্রিই সেরে ফেললাম।

'কোন মানুষের পক্ষে এখন এখানে ঢোকা কিংবা পোর্ট খোলা সম্ভব হবে না।'

'ভেরি গুড,' শান্ত স্বরে বলল ক্যাপ্টেন। 'আমরা এরপরও কিছু দেখতে পেলে ভাবব ব্যাপারটা হয় কল্পনা আর নয়তো আমাদের ব্যাখ্যার অতীত।'

লোয়ার বার্থের কিনারায় বসলাম আমি।

'প্রথম ঘটনাটা ঘটে গত মার্চে,' বলে ক্যাপ্টেন। 'আপার বার্থে যে প্যাসেঞ্জার শোয় হঠাৎ করে তার মাথা যায় খারাপ হয়ে। উন্মাদের মত মাঝরাতে ছুটে বেরিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পরের ট্রিপে–কী দেখছেন আপনি?' সহসা প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন।

জবাব দিয়েছিলাম কিনা মনে পড়ে না। আমার দু'চোখ স্থির ছিল পোর্টহোলে। দৃষ্টিভ্রম কিনা কে জানে, পিতলের স্ক্রুটা ধীরে, অতি ধীরে ঘুরে যাচ্ছে বলে মনে হলো। আমার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে ক্যাপ্টেনও সেদিকে তাকাল।

'নড়ছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'না, নড়ছে না,' এক মিনিট বাদে বলল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করলাম। খানিকটা ঢিলে তো হয়েছেই, কেননা নড়াতে পারলাম।

'দ্বিতীয় যাত্রী আমাদের ধারণা ওই পোর্ট গলে পড়ে গেছে। তখন ছিল মাঝরাত, সাগর ফুঁসছে। পোর্ট ছিল খোলা। আমরা লাগাতে পারি ওটা, তবে নোনা পানি তার আগে যথেষ্ট ক্ষতি করে দেয়। তারপর থেকে এখানে নোনা পানির গন্ধ পাওয়া যায় মাঝে মাঝেই। লোকটা কী করে যে অতটুকু একটা ফাঁক গলে পড়ল! ওই যে, গন্ধ পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' বললাম। 'অথচ সকালে দেখেছি স্যাঁতসেঁতে কোন ভাব নেই। আজব ব্যাপার। আরে!'

প্রদীপটা নিভে গেল। দরজার কাছের কাঁচটা থেকে প্রচুর পরিমাণ আলো আসছে তখনও। ভীষণ রকম দুলছে জাহাজ, আপার বার্থের পর্দার খেপা নাচ দেখে কে।

ঠিক সে সময় ক্যাপ্টেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হতচকিত চিৎকার ছাড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে ঝাঁপ দিলাম আমি। পোর্টের স্ক্রু যথাস্থানে ধরে রাখতে প্রাণপণ যুঝতে হচ্ছে তাকে। ভারী এক লাঠির ব্যবস্থা রেখেছিলাম, রিঙের ভেতর ঢুকিয়ে গায়ের জোরে চেপে ধরলাম। কিন্তু শক্ত কাঠটা চাপ সইতে পারল না, ভেঙে গেল এবং পড়ে গেলাম আমি। আবার যখন উঠলাম, হাট হয়ে খোলা পোর্ট। ক্যাপ্টেন দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ানো, মুখ পাংশু।

'ওই বার্থে কিছু একটা আছে!' অচেনা শোনাল তার কণ্ঠস্বর, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। 'আপনি দরজাটা আগলে রাখুন, আমি দেখছি–ওটাকে পালাতে দেব না।'

কিন্তু ক্যাপ্টেনের কথা না শুনে লোয়ার বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি, এবং আপার বার্থে শুয়ে থাকা জিনিসটাকে জাপটে ধরলাম।

বীভৎস এক জিনিস, কী তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না, নড়েচড়ে উঠল আমার হাতের মধ্যে। পানিতে ডুবে মরা মানুষের মত অবয়ব ওটার, কিন্তু গায়ে দশজন পুরুষের সমান জোর। ছাড়লাম না, ভেজা, পিচ্ছিল, কুৎসিত জিনিসটাকে সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরে রইলাম। আঁধার থেকে যেন মৃত

একজোড়া চোখ স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল আমার দিকে। সারা দেহে ওটার নোনা পানির ঘ্রাণ, চকচকে ভেজা কোঁকড়া চুল ছড়িয়ে আছে মরা মুখটার ওপর। লড়াই করছি ওটার সাথে, আমাকে পেছনে আসুরিক ধাক্কা দিয়ে হাত ভেঙেই দিল প্রায়। দু'বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল আমার গলা। শ্বাস আটকে এল, ধপ করে পড়ে গেলাম আমি।

আমার ওপর দিয়ে টপকে পার হয়ে ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে নিজেকে ছুঁড়ে দিল ওটা। শেষ যখন দেখলাম, মুখ ফ্যাকাসে আর ঠোঁট স্থির ছিল তার। আমার মনে হলো বীভৎস আকৃতিটাকে মরণ আঘাত হেনেছে ক্যাপ্টেন, এবং তারপর চিৎকার ছেড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

মুহূর্তের জন্যে থমকাল ওটা, কিন্তু চেঁচাতে পারলাম না আমি, গলায় স্বর ফুটল না। হঠাৎই মিলিয়ে গেল ওটা, খুব সম্ভব পোর্ট গলে। কিন্তু অত ছোট ফাঁক দিয়ে কী করে বেরোল প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব না। আমি আর ক্যাপ্টেন পাশাপাশি অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম মেঝেতে। অবশেষে নড়লাম যখন, টের পেলাম বাঁ হাতের কব্জির হাড় ভেঙে গেছে।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, ভাল হাতটা বাড়িয়ে দিলাম ক্যাপ্টেনের দিকে। শেষমেশ নড়ে উঠতে তার জ্ঞান আছে বুঝলাম।

'আরও শুনতে চান?' আমাদের উদ্দেশে বলল ব্রিসবেন। 'ও ঘর তারপর থেকে আর কাউকে ভাড়া দেয়া হয় না। একশো পাঁচের দরজা স্ক্রু মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'ডাক্তারের রুমে ছিলাম শেষ কটা দিন। আমার হাতের চিকিৎসা সে-ই করে, আর ভূতের সাথে ভবিষ্যতে খেলা করতে নিষেধ করে দেয়। এ ঘটনার পর ক্যাপ্টেন একদম চুপ করে যায়। ও জাহাজে সে আর চাকরি করেনি, যদিও এখনও নিয়মিত চলাচল করছে ওটা। যে ভয় পেয়েছি, আমিও আর এ জন্মে ওটায় চাপছি না। আমার ভুতুড়ে অভিজ্ঞতার কাহিনী তো শুনলেন, কেমন লাগল আপনাদের?'

মূলঃ ফ্রান্সিস মারিয়ন ক্রফোর্ড
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

পুনরুত্থানের ঘণ্টা

গির্জার ঘণ্টাধ্বনির প্রতি আমি সাজ্ঘাতিকভাবে ভীত ও বীতশ্রদ্ধ। গভীর রাতে এই ঘণ্টাধ্বনি আমার সমস্ত শরীরে ভীতির হিমশীতল স্রোত বইয়ে দেয়। মনে হয় যেন তিরুপল্লীর সেই অশরীরী মিছিল আমার ঘরের দরজায় ভিড় জমিয়েছে।

বীভৎস, অপার্থিব সেই সব দৃশ্য। যেগুলো এখনও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের পর্দায় দেখে চিৎকার করে উঠি। ভয়ে গা-হাত-পা যেন জমে যায় পাথরের মত। দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকে সারা শরীরে। প্রকৃতিস্থ হতে সময় লাগে।

সেই ভয়াবহ, অতিপ্রাকৃত ঘটনাটা আজ একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেটা আমারই জীবনে ঘটেছিল। তার প্রধান সাক্ষী আমার স্ত্রী। আরও সাক্ষী 'ঘণ্টাঘর' হোটেলের মালিক নবাব এফেন্দি ও তাঁর স্ত্রী মিসেস এফেন্দি, যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন কি না জানি না। এ ছাড়া ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্নেল রত্নাকর গিরি। এঁরা বেঁচে থাকলে সাক্ষ্য দিতে পারতেন আমার হয়ে এবং বলতে পারতেন, এ ধরনের ঘটনা প্রকৃতই ঘটেছিল এবং প্রতিবছর এক বিশেষ সময়ে সেটা ঘটে থাকে।

আমি তখন মাদ্রাজে। সবে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী লীনা মাদ্রাজে প্রবাসী বাঙালী ঘরের মেয়ে। মোটামুটি সুন্দরী মহিলা। সবে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার প্রচণ্ড মানসিক ও দৈহিক চাপ পড়ায় কিছুটা ক্লান্ত ছিল। সুতরাং ঠিক করলাম মাসখানেকের জন্যে কোন সমুদ্রতীরবর্তী মফঃস্বল শহরে হানিমুনে যাব আমরা। আর তেমন একটা শহরের খোঁজখবর নিতে গিয়ে তিরুপল্লী নামক শহরের নামটা সর্বাগ্রে এগিয়ে এল।

তিরুপল্লী মাদ্রাজ লাইনের এক অখ্যাত ও অবজ্ঞাত শহর। যতদূর জেনেছিলাম জায়গাটা বহুপূর্বে সমুদ্র বন্দর হিসাবে খ্যাত ছিল। কিন্তু সমুদ্রের নীচে চড়া পড়ে যাওয়ায় কোন জাহাজ ভিড়তে পারত না। ফলে এককালের প্রখ্যাত বন্দর তার কার্যকারিতা হারিয়ে এখন এক জরাজীর্ণ অবহেলিত স্থানে পরিণত হয়েছে। এর একদিকে সমুদ্র ও অন্য তিনদিকে পাহাড় ও টিলার সমাবেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব এক সমন্বয় ঘটেছে শহরটায়। জনসংখ্যা খুবই কম। শহরে সবরকম সুযোগ সুবিধে থাকলেও কোন কর্মব্যস্ততা নেই। শান্ত, নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা। শীতের সময় যা অল্প বিস্তর ট্যুরিস্ট দেখা যায়, বছরের অন্যান্য সময় শহর প্রায় ফাঁকাই থাকে। হোটেলে সীটের কোন অভাব থাকে না তখন। যে দু'চারটে ভাল হোটেল আছে, তার মধ্যে 'ঘণ্টাঘর' উল্লেখযোগ্য। অল্প পয়সায় আরাম আয়েশের অভাব হয় না, বিশেষ করে হোটেলের দোতলা বা তিনতলার জানালা দিয়ে চমৎকার উপভোগ করা যায় সমুদ্র। হুহু বাতাস আসে সাগরের লবণাক্ত স্বাদ নিয়ে।

কাগজ অফিসে আমার এক সহকর্মী বন্ধু তিরুপল্লী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিল। মাস কয়েক আগে সেখান থেকে ঘুরে এসেছে সে, সুতরাং তার কথায় আস্থা রাখা যায়। আর সে আস্থা নিয়েই আমি রেলওয়ে গাইড ঘেঁটে ট্রেনের সময়সূচি জেনে নিয়ে ফোন করলাম লীনাকে। শুনে খুশি হয়ে সম্মতি জানায় সে। টেলিফোনেই জানতে চাইল, 'আচ্ছা, হোটেলের নাম ঘণ্টাঘর কেন? কেমন অদ্ভুত নাম, তাই না?'

'তা তো বটেই। আমার মনে হয় হোটেলের মাথায় কোন ঘণ্টাটণ্টা

ঝোলানো আছে, সেজন্যে,' আমি জবাব দিলাম।

'যাকগে, নাম দিয়ে কী হবে? জায়গা ভাল হলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'যতদূর শুনলাম, চমৎকার জায়গা, লীনা। একবার গেলে ফিরতে মন চায় না।'

'তাই নাকি! তবে তো এখনই রওনা দিতে হয়।'

'এখন না হলেও, সময় খুব বেশি নেই। বিকেল পাঁচটায় ট্রেন—আমি টিকিট বুক্ করেছি।'

'ও বাবা! এত শিগ্গির। ঠিক আছে, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি।'

'প্লীজ।'

'তুমি বাসায় ফিরবে কখন?'

'দুটোয়!'

'বেশ চলে এসো।' লীনা ফোন রাখল।

আমরা যখন ট্রেনে চাপি, সে সময় আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। এবং ট্রেনে আমরা নিজেদের মধ্যে গল্পেগল্পে এত বিভোর ছিলাম যে ইতিমধ্যে কখন আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে, টের পাইনি। টের পেলাম ট্রেন যখন তিরুপল্লী স্টেশনে এসে থামল। দেখলাম অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চতুর্দিক। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে আর সাথে শোঁ শোঁ হাওয়া। রাত তখন সাড়ে সাতটা। ছোট্ট স্টেশন। কয়েকটা গ্যাসলাইট মিটমিট করে জ্বলছে প্লাটফর্মে। এতক্ষণ ট্রেনের আলো ছিল বলে অন্ধকারের চাপ টের পাইনি। ট্রেন চলে যেতেই একরাশ অন্ধকার নেমে এল চারদিকে।

সত্যি বলতে কি, প্লাটফর্মে নেমেই আমার মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল। এ কোথায় এলাম? স্টেশন জনমানবশূন্য। একটা কুলির পর্যন্ত দেখা নেই। কী করি! দুহাতে দুটো সুটকেস নিয়ে সোজা গেটে এসে থামলাম। সামনে স্টেশন মাস্টার, তার পাশে বোধ হয় পয়েন্টস্ম্যান। স্টেশনের টিমটিমে আলোয় একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। অন্য কোন যাত্রী না থাকায় আমি টিকিট দুটো স্টেশন মাস্টারের হাতে দিয়ে হোটেলের খবর নেবার চেষ্টা করলাম। 'ঘণ্টাঘর হোটেলটা কতদূর হবে?'

'তিন কোয়ার্টার পথ। এই রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে বামে মোড় নিলেই দেখবেন শহরটা।'

'এখানে রিকশা বা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না?'

'যায়, তবে আজ পাবেন না।'

'কেন?'

'আজ ওরা বের হবে না।'

ইতিমধ্যে রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে কোথাও যেন গির্জার ঘন্টাধ্বনি ভেসে এল ঢং ঢং করে। মুহূর্তে পয়েন্টস্ম্যানের মুখ সাদা বিবর্ণ হয়ে গেল। ফিস্‌ফিস্

করে স্টেশন মাস্টারকে বলল, 'আজ দেখি সকাল সকাল শুরু হয়ে গেল।'
'হুঁ।' ভাবলেশহীন গলায় জবাব দিল মাস্টার।
'দেখুন, আমাদের যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যায় না?' আমি বলি এবার।
'মনে হয় না। তা ছাড়া এ সময়টা ঠিক বেড়াবার সময় নয় কিনা!' জবাব এল।
'মুস্কিল!'
'আপনারা এক কাজ করেন না হয়। আজকের রাতটা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে থেকে যান। কাল সকালে শহরে যাবেন।'
'কী দরকার। সামান্য পথ, হেঁটে যেতে পারব,' লীনা রাগতভাবে বলে।
'সে আপনাদের ইচ্ছা। তবে...'
'তবে কী?'
'না গেলেই বোধহয় ভাল করবেন।'
লীনার তাগিদে স্টেশন ছেড়ে পথে নামলাম, ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু শোঁ শোঁ করে বাতাস দিচ্ছে বেশ। স্টেশন মাস্টারের নির্দেশমত এগোচ্ছি দু'হাতে দুই সুটকেসের বোঝা নিয়ে; আর মনে মনে অভিসম্পাৎ করছি এই বিরূপ আবহাওয়ার। পথের দুপাশে কোন ঘরবাড়ি নেই। একধারে লম্বা টানা দেওয়াল, বোধহয় কোন হাসপাতাল বা রেলওয়ে জমির সীমানা। অন্য দিকে গাছপালা, ঝোপঝাড় ও টিলা। লীনা পাশে হাঁটছিল। হঠাৎ করে হোঁচট খেয়ে বলল, 'কী ভূতুড়ে শহর রে বাবা! কোন লোকজন নেই নাকি?'
আর সত্যি সত্যি, আধ মাইল পথ পাড়ি দিয়েও কোন মানুষজনের দেখা পেলাম না। তবে শহরে যে পৌঁছে গেছি, তার নমুনা পেলাম, দু'পাশের অন্ধকারে ঘরবাড়ি দেখে। একটা বাড়িতেও কোন আলো নেই। সম্পূর্ণ অন্ধকার, যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ঢং ঢং করে একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে সেই তখন থেকেই। শব্দের জোর ক্রমশ বাড়ছে যেন। বামহাতের বাঁক পার হয়ে একটা তেমাথায় এসে সৌভাগ্যবশত সামনে পেয়ে গেলাম 'ঘণ্টাঘর'। তেমাথায় এসেই যৎসামান্য আলো দেখলাম প্রথম। এবং সেই গ্যাসপোস্টের আলোয় একটি তিনতলা বাড়ির মাথায় বিশাল এক ঘণ্টা ঝুলতে দেখে বুঝলাম কেন এই হোটেলটাকে ঘণ্টাঘর বলা হয়। নমুনা হিসেবে ঢং ঢং করে ঘণ্টার শব্দ ভেসে এসে আকৃষ্ট করছিল আমাদের।
হোটেলের সদর দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলাম আমরা। লম্বা হলঘর। একধার দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির নীচে হোটেলের কাউন্টার। এক প্রৌঢ়া মহিলা আমাদেরকে দেখে উঠে এগিয়ে এলেন। মুখে তাঁর বিস্ময়ের চিহ্ন। 'আপনারা, এই অসময়ে?'
'বেড়াতে এসেছি। আমাদের জন্যে ভাল সীট হবে তো?'
'সীট কেন, সারা হোটেলই খালি আছে। তবে এ সময় সাধারণত কোন ট্যুরিস্ট আসেন না তো, তাই বাড়তি কোন বয় বেয়ারা থাকে না। তবে সেজন্যে

কোন চিন্তা করবেন না, আমি একাই ম্যানেজ করে নেব,' মহিলা বললেন।

তিনতলার একটা চমৎকার ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে উনি নেমে এলেন। পথশ্রমে বেশ খানিকটা ক্লান্ত থাকায় আমরা হোটেল লাউঞ্জে বসেছিলাম। উনিও এসে বসলেন সামনে। আলাপ হলো মিসেস নবাব এফেন্দির সাথে। অমায়িক ভদ্রমহিলা। দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছেন। তাঁর স্বামী প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, সে কারণে ডাক্তারের পরামর্শমত সমুদ্র তীরবর্তী এ শহরে এসেছিলেন স্বামীর হাওয়া বদলানোর প্রয়োজনে। এবং এখানে থাকতে গিয়ে বুদ্ধি করে নিজেই এক হোটেল খুলে বসেছেন। হোটেলের আয় থেকে এখন সংসার চলে তাঁর। কথায় কথায় আরও জানলাম যে এখন আমরা দু'জন ছাড়া আর একজন স্থায়ী বোর্ডার আছেন। ভদ্রলোক চিরকুমার, রিটায়ার্ড একজন কর্নেল, নাম রত্নাকর গিরি। খুবই মিশুক ভদ্রলোক। অবসর জীবনটা হোটেলেই কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে তাঁর। ঘণ্টার শব্দ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন শহরে বিভিন্ন বাড়ির মাথায় ও গির্জায় অনেক ঘণ্টা আছে। সমুদ্রের বাতাসে দোল খেয়ে ঘণ্টাগুলো চমৎকারভাবে বাজতে থাকে। প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত কানে কর্কশ শোনালেও, এক সময় কান অভ্যস্ত হয়ে গেলে ভালই লাগবে।

কথাবার্তা শেষে আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন মিসেস এফেন্দি। তিনতলার উপর চমৎকার সুসজ্জিত প্রশস্ত ডাবল বেডের 'স্যুইট'। এটাই এই হোটেলের সেরা ঘর। আমরা হানিমুনে এসেছি শুনে এই ঘর পছন্দ করে দিয়েছেন উনি। পছন্দ হবার মত ঘরই বটে। সামনের লম্বা পর্দা সরিয়ে কাঁচের শার্সি খুলে দিতেই হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া যেন উড়িয়ে নিতে চাইল আমাদের। দেখলাম রাস্তার টিমটিমে আলো সার বেঁধে সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে বিন্দু বিন্দু হয়ে। এরপর ঘন কালো অন্ধকারে বোঝা যায় সমুদ্রের শুরু।

'রাতে খাবেন তো?' জানতে চাইলেন উনি।

'অবশ্যই।'

'আপনারা বিশ্রাম নেন। আমি খাওয়া রেডি করি।' মিসেস এফেন্দি চলে গেলেন নীচে।

'চমৎকার ঘর!' লীনা উচ্ছ্বসিত হয় এতক্ষণে।

'এত কষ্টের পর এটাই সান্ত্বনা,' আমি বলি।

'কটা বাজে দেখো তো।'

'আটটা পঁচিশ।'

'এখনও সন্ধ্যারাত। আমরা একবার সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে আসতে পারি না?'

'তাহলে চলো বেরিয়ে পড়ি। বৃষ্টি তো নেই।'

'চলো!'

মিসেস এফেন্দি কাউন্টারে ছিলেন না। সম্ভবত রান্নাঘরে ব্যস্ত। সেজন্যে

দেখা হলো না। আমরা কাউন্টারে একটা চিরকুট রেখে রাস্তায় নেমে এলাম।

ঢং ঢং ঢং ঢং। বিভিন্ন দিক থেকে ক্রমাগত ঘণ্টা বেজে চলেছে। থামার কোন লক্ষণই নেই, বরং প্রতিমুহূর্তে শব্দ যেন বাড়ছে সামুদ্রিক শোঁ শোঁ হাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে। পথের দুধারে সব ঘরবাড়ি অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ। এ শহরের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। এরা কি সব সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ঘরে ঢুকে খিল দেয় নাকি! একটা জনপ্রাণী যদি রাস্তায় থাকে। এমন কী কোন কুকুর বিড়ালও নজরে পড়ল না।

রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পড়লাম। বেশ চওড়া পাথরের বাঁধ দিয়ে ঘেরা শহর। বাঁধের মাঝে মাঝে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। এমনই এক চওড়া সিঁড়ি ধরে নীচে নামার প্রচেষ্টা নিচ্ছি, এমন সময় নাকে ভেসে এল পচা ভ্যাপসা গন্ধ। সমুদ্রে বোধহয় মাছ বা কুকুর বিড়াল পচেছে ভেবে টর্চ জ্বালিয়ে পাথরের সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকলাম গ্রাহ্য না করে। বেশ খানিকটা নামার পর হঠাৎ নিভে গেল টর্চটা। ব্যাটারি ফিউজ হয়ে গেছে বোধহয়। লীনা তরতর করে নেমে যাচ্ছে আপন মনে। আমি পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকলাম। অন্ধকারে ও যদি পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙে। দ্রুত নেমে গেলাম ওকে ফিরিয়ে আনতে। যত নামছি, ততই সেই পচা গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে নাকে লাগছে। ওদিকে শহরের ঘণ্টাধ্বনিও প্রচণ্ডতর হচ্ছে ক্রমে। মনে হয় সারা শহরের ঘণ্টা একসাথে বাজতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে লীনা আর্তচিৎকার করে উপরে উঠে এল।

'কী হলো? আমি প্রশ্ন করি।'

'কী জানি, পচামত কীসে যেন পা পড়ল। নরম থলথলে কাদার মত। উঃ, কী গন্ধ, বমি হয়ে যাবে।'

'চলো, ফেরা যাক।'

'চলো!'

হোটেলে ফিরতেই মিসেস এফেন্দি গম্ভীর মুখে বললেন, 'অপরিচিত জায়গায় এতরাতে ঘোরাটা ঠিক হয়নি আপনাদের।'

'কেন, চোরডাকাতের ভয় আছে নাকি?'

'হাজারটা বিপদ আপদ থাকতে পারে। যা হোক, আর এভাবে বাইরে যাবেন না।'

'ঠিক আছে।'

'কফি খাবেন?'

'মন্দ হয় না।'

'তাহলে এখানে বসুন, আমি আনছি।'

হোটেলের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে মিসেস এফেন্দি ভিতরে গেলেন। কথাবার্তা কেমন যেন রহস্যময়। আমরা ঠিক বুঝে ওঠার আগেই

সিঁড়ির ওদিক থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে প্রায় ছয়ফুট লম্বা এক ব্যক্তি বের হয়ে এলেন। চুল উস্কখুস্ক, নোংরা বেশভূষা, চোখ লাল। মুখ দিয়ে ভক্ ভক করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে। লোকটা হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আজ রাতে বুঝি আপনারা এসেছেন?'

'জ্বী!'

'আজ আসাটা ঠিক হয়নি।'

'ব্যাপার কী বলুন তো? সবাই সেই একই কথা বলছে এখানে। আমরা এসে আপনাদের অসুবিধা করলাম নাকি?'

'অসুবিধা আমাদের নয়, আপনাদের। আমরা পুরনো লোক, অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি রাতটা মদে বেহুঁশ থাকি, কিছু টেরও পাইনে। বুড়ি, মানে আমার মিসেস, এই হোটেলের মালিক, সারারাত ধরে কী সব দোয়াদরুদ পড়ে ওর ঘরে বসে–সেখানে ওরা পাত্তা পায় না। কর্নেল রত্মাকর গিরিও মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে প্রার্থনা করেন। ওঁকে আজকাল কেউ বিরক্ত করে না। সমস্যা আপনাদের নিয়ে।'

'ওরা কারা, মানে কাদের কথা আপনি বলছেন?'

'ওরা সব ওপারের লোকজন।'

'ওপারের লোকজন? কি বলছেন আপনি?'

'দেখলেই বুঝবেন।'

ইতিমধ্যে মিসেস এফেন্দি কফি নিয়ে আসলেন। এসেই ভাগালেন তাঁর নেশাগ্রস্ত স্বামীকে। 'আবার তুমি গিলে এসে বক্‌বক্ শুরু করেছ! ছেলেমানুষদের খামোকা ভয় দেখাও, লজ্জা করে না? যাও তো এখান থেকে।'

মুখ বন্ধ করে নবাব এফেন্দি চলে গেলেন।

'এই নিন কফি। ওর মাথায় ছিট আছে, বুঝলেন, সব সময় মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে। ওর কোন কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। যাই দেখি, আপনাদের খাবার কতদূর।' কফির কাপগুলো সামনের টেবিলে রেখে মিসেস এফেন্দি ভিতরে চলে গেলেন আবার।

কফির কাপে হাল্‌কা চুমুক দিলাম। শীত শীত বর্ষায় ভালই লাগছিল কফিটা। ঝিরঝির করে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেখলাম জানালার কাঁচের শার্সি দিয়ে। শোঁ শোঁ হাওয়া প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ঝাপটা দিচ্ছে কাঁচে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম সামনের তেমাথা পথ। একটা কাকপক্ষীও নেই বাইরে। খাঁ খাঁ বিরান।

'ব্যাপারটা কী এদের?' লীনা স্বগতোক্তি করে।

'কী জানি। কেমন যেন রহস্যময় লাগছে।'

'ভদ্র মহিলা কী যেন চেপে গেলেন।'

'পোড়োবাড়ি নাকি? কোন ভয়টয় আছে হয়তো?'

'হ্যাঁ, ভয় আছে, তবে অন্য ভয়।' ঘরের কোনা থেকে কার যেন গুরুগম্ভীর

কণ্ঠ ভেসে এল।'

'কী? কে আপনি?' চমকে উঠে বলি।

'রত্নাকর গিরি আমার নাম, এই হোটেলেই থাকি,' জবাব এল।

'শুনেছি আপনার কথা। এখানে আসুন না, কথা বলা যাবে।'

'থ্যাংকস।'

সেই আলো অন্ধকার থেকে সুট পরা বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক মুখে চুরুট গুঁজে এগিয়ে এলেন। শেকহ্যান্ড করে বসলেন আমার পাশে। এরপর এটা ওটা নানান কথা, নানান গল্প। তিরুপল্লী শহর সম্পর্কে একটা মোটামুটি ইতিহাস শুনলাম ওঁর মুখে। ১৮১৫ সালের ঘটনা সেটা। এর আগে পর্যন্ত বন্দর হিসাবে ভাল একটা পরিচিতি ছিল তিরুপল্লীর। এখান থেকে জাহাজ যেত মাদ্রাজ, ত্রিচিনোপল্লী, কোচিন, ভিজাগাপত্তম বন্দরে, আবার বিভিন্ন বন্দর থেকে জাহাজ নোঙর করত এখানে। ১৮১৫ সালের ১৬ জুলাই, হঠাৎ করে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সমগ্র বন্দর শহরটা ধ্বংস হয়ে গেল। মারা গেল এ শহরের সমগ্র জনমানুষ। এমন কী, শোক করার জন্যে একটা কুকুর বিড়াল পর্যন্ত বাঁচেনি। পানি নেমে যাওয়ার পর গির্জার ঘণ্টাগুলো পরপর কয়েকদিন ধরে বাতাসে দুলে দুলে বাজতে থাকল এ শহরের জন্যে শোকপ্রকাশ করতে। তারপর থেমে গেল এক সময়। এবং সেদিন থেকেই তিরুপল্লীর সমৃদ্ধি ও খ্যাতি শেষ। এরপর অবশ্য মানুষ এসেছিল, কিন্তু তেমন আর জমে ওঠেনি শহর। সমুদ্রের তলায় বালির চড়া জমেছে ক্রমে, জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে একসময়। বন্দর হিসেবে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তিরুপল্লী।

রত্নাকর গিরির কাছ থেকে আরও জানা গেল যে আজ সেই ঐতিহাসিক ১৬ জুলাইয়ের রাত। এই ভয়ঙ্কর রাতে নাকি সাগর থেকে দলে দলে উঠে আসে অশান্ত আত্মারা এবং সারারাত ধরে শহরময় তাণ্ডব করে বেড়ায়। সেজন্যই যা ভয় আজকের রাতটাতে।

হো হো করে হেসে প্রশ্ন করলাম, 'বিংশ শতাব্দীতে এসব ফ্যানটাসি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, মি. গিরি?'

'বেশ তো, চোখে দেখলে বিশ্বাস করবেন?'

'ঠিক আছে, নতুন এক অভিজ্ঞতা হবে না হয়, কী বলো লীনা?'

'আমার কেন যেন ভাল লাগছে না এসব,' লীনা ভয়জড়ানো গলায় বলে।

'ট্র্যাশ! আচ্ছা, আপনাদের শহরে কি লোকজন নেই?'

'থাকবে না কেন! তবে আজ রাতে কেউ সাধারণত শহরে থাকে না! আশেপাশের গ্রামে চলে যায়। কাল সকাল থেকে সবাই ফিরতে শুরু করবে।'

'আপনারা পালালেন না কেন?'

'আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া...'

হঠাৎ প্রবলভাবে ঘণ্টা বাজা শুরু হলো। সেই সাথে দমকা হাওয়া রূপ নিল ঝড়ে। ভয়ে লীনার মুখ শুকিয়ে আসল, আমতা আমতা করে একবার বলল,

'আচ্ছা, মি. গিরি, এখন আমরা পালাতে পারি না?'

'আর সময় নেই, ম্যাডাম। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। এতক্ষণে ওরা সমুদ্র থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে। দেখছেন না, কীভাবে ঝড় বাড়ছে।'

'আমাদের ভয়টা কীসের? ভাল করে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব, কী বলেন? তা ছাড়া নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি ওসবে বিশ্বাসী নই,' সাহস করেই বললাম কথাগুলো।

ইতিমধ্যে মিসেস এফেন্দি আমাদের খাওয়ার জন্যে ডাকতে এলে উঠলাম তখনকার মত।

খাওয়ার টেবিলে তিনি মুখ খুললেন, 'আপনারা বোধহয় সব শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'ভয় পাওয়ার এমন কিছু নেই। আমরা তো আছিই। তা ছাড়া, আপনাদের পাশের ঘরে থাকবেন মি. গিরি।'

'কোন অসুবিধে নেই। একমাত্র লীনা যা কিছু ঘাবড়ে গেছে। আসলে ও খুব নার্ভাস কি না, তাই।'

'আপনারা এমন একটা সময়ে আসলেন আবার যে ফেরৎ পাঠাব, সে সুযোগও ছিল না। দেখলেন তো যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই। অবশ্য আজ রাতটাই যা সমস্যা। কাল সকাল থেকে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। আমরা ঘুমিয়ে রাত কাবার করে দেব।'

খাওয়াদাওয়ার পর আবার আমরা লাউঞ্জে ফিরে গেলাম। কর্নেল রত্নাকর গিরি তখনও বসে বসে চুরুট টানছিলেন। আমরা বসলাম তাঁর সামনে। ঝড়ের দাপট আরও বেড়েছে ইতিমধ্যে। মনে হচ্ছে বৃষ্টির পানি জানালার শার্সিতে নখ দিয়ে আঁচড় দিচ্ছে হিংস্র বিড়ালের মত। ঘণ্টাধ্বনির প্রচণ্ড শব্দে যেন মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত। জানালার শার্সির পর্দাটা সরাতেই ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। তেমাথার মোড়ে গ্যাস লাইটের ধারে অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা এক লোক দাঁড়িয়ে। তার পরিধানে গির্জার সন্ন্যাসীদের মত লম্বা জোব্বা। ঠিক সেই সময় দেয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল।

'চলেন! আর নীচে বসা ঠিক হবে না,' রত্নাকর গিরি বললেন আমাদের।

'হ্যাঁ, চলেন উপরে যাই।'

তিনজনে উঠে গেলাম তিনতলায়।

আমাদের ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে পাশের রুমের তালা খুললেন উনি। বললেন, 'যে কোন প্রয়োজনে ডাকবেন। আমি সজাগই থাকি।'

আমি সম্মতি দিলাম মাথা হেলিয়ে। উনি ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে। দেখলাম ওঁর দরজার পাশে তামার একটা বড় পিকদানী স্ট্যান্ডে রাখা। অন্ধকারে সেটা মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ারের মত দেখাচ্ছিল। উনি ভিতরে ঢুকতেই আমরাও ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের ভিতরে পিতলের চেরাগ জ্বলছে। পাশে মোমবাতিস্ট্যান্ডে বেশ কিছু মোমবাতি লাগানো। তার পাশে একটা ম্যাচ।

মিসেস এফেন্দি সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ভাল করে দরজাটা বন্ধ করে সারাটা ঘর দেখে নিলাম। জানালার শার্সিগুলো ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করলাম। সব কিছু ঠিকঠাক। তেমাথায় দৃষ্টি ফেললাম কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে। ফাঁকা পরিষ্কার পথ। কেউ কোথাও নেই। আসলে আজেবাজে গালগল্প শুনে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছিল আমার। ভাল করে পর্দাটা টেনে দিয়ে এতক্ষণে আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালাম আমি। লীনা চাদর টেনে শুয়ে পড়েছে খাটে।

'কী সব কাণ্ড বল তো?' ও ঘুমোয়নি।

'হ্যাঁ, এখানে এসেই সব শুনছি ও দেখছি।'

'আমার কিন্তু খুব ভয় ভয় করছে।'

'ভয়ের কী আছে? যতসব অবাস্তব ব্যাপার।'

'কিন্তু সমুদ্রের সিঁড়িতে সেই পচা গন্ধ?'

'কুকুর বিড়াল পচেছে হয়তো।'

'না! মানুষের পচা দেহ—তখন বলিনি। গন্ধটা কিন্তু মানুষের লাশের।'

'হবে হয়তো। কেউ ডুবে মরেছে, তার দেহ,' আমি সাহস সঞ্চয় করে বলি।

সিগারেটটা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় মানুষের কোলাহল শোনা গেল। দ্রুত উঠে গেলাম জানালায়। পর্দা সরিয়ে যা দেখলাম প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। তেমাথায় বহুলোকের জমায়েত হয়েছে। বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর। সবাই উৎফুল্ল, হাসছে, চিৎকার করছে, নাচছে পথ জুড়ে। মনে হলো যেন শহর জুড়ে আনন্দ মিছিল বের হয়েছে। ঘণ্টাধ্বনির প্রচণ্ড নিনাদ কখন যেন থেমে গেছে। ঝড়বৃষ্টি কোথায় গেছে কে জানে। চমৎকার জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে সারা শহর। এই সব মানুষের আনন্দ উল্লাসের মাঝে শ্লোগানের যে শব্দ পেলাম, কান পেতে ভাল করে শুনতেই বুঝলাম কথাগুলো। তারা চিৎকার করছে, 'মুর্দারা জীবিত হয়েছে এখন। কে কোথায় আছ এসো—আনন্দে যোগ দাও। মুর্দারা এখন জীবিত।'

হঠাৎ কাঁধে কার যেন স্পর্শে চমকে উঠলাম। লীনা কখন যেন উঠে এসেছে আমার পাশে। আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'তাহলে সত্যি সত্যি ওরা উঠে এসেছে!'

'তাই তো দেখছি।'

'কি হবে এখন?'

'ভয় কী? আমি আছি। যাও শুয়ে পড়ো।'

জানালায় ভাল করে পর্দা টেনে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। বাইরের উল্লাসধ্বনি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। এই অপার্থিব জনতা সারা শহরে মিছিল করে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থা কতক্ষণ চলল জানি না, হঠাৎ করে হোটেলের সদর দরজা ভেঙে পড়ার শব্দে চম্‌কে উঠলাম। লীনা ভয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

তাকে শান্ত করার চেষ্টা করব কি, সারা হোটেল জুড়ে তখন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। নীচের হলরুমে দাপাদাপি, চেয়ার টেবিল ভাঙার শব্দ, বাসন পেয়ালা উল্টে ফেলার ঝনঝন আওয়াজ ভেসে আসছিল। সেই সাথে অপার্থিব চিৎকার, অট্টহাসি ও দৌড়াদৌড়ি। সিঁড়িতে কাদের যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। পদশব্দ করিডরে। পাশে রত্নাকর গিরির দরজায় করাঘাত শুনলাম। তামার পিকদানী মেঝেয় পড়ল ঝন্ ঝন শব্দে। এর সাথে সেই হিম শীতল আহ্বান, 'মুর্দারা জীবিত এখন, তোমরা বেরিয়ে এসো।'

পরপর প্রচণ্ড এক শব্দে আমাদের ঘরের দরজার ছিটকানি খুলে গেল। এক সাথে কয়েকজন ছায়ামূর্তি ঢুকে পড়ল ঘরে। সেই সাথে তীব্র পচা গন্ধ। 'তোমরা চলে এসো! বেরিয়ে এসো!' চিৎকার করছে তারা। বীভৎস তাদের মুখভঙ্গি, উৎকট অট্টহাসি। লীনা তো সাথে সাথে অজ্ঞান। সেই অবস্থায় আমি তাকে ঘিরে রাখলাম। এবং ওরা আমাদের দুজনকে ঘিরে ধরে নাচতে শুরু করল, যেন বেশ একটা মজা পেয়েছে তারা। তারপর কয়েকজন লীনার অচেতন দেহ জোর করে টেনে বাইরে নিতে চেষ্টা করল। আমি তাদের বাধা দিতেই সাথে সাথে কয়েকজোড়া নরম থল্‌থলে হাত এসে চেপে ধরল আমাকে। এত নরম হাত, অথচ কী প্রচণ্ড শক্তি। সেই সাথে তীব্র পচা গন্ধ। আমি বন্দী হয়ে গেলাম তাদের কাছে। দেখলাম লীনাকে হাতে হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদের সাথে টেনে নিয়ে চলল আমাকেও।

সিঁড়ি থেকে নামা পর্যন্ত বোধ ছিল আমার। এরপর কখন যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই।

পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরলে নিজেকে হোটেলের বিছানায় দেখলাম। পাশের বিছানায় লীনাও শুয়ে। বিছানার পাশে বসেছিলেন মিসেস এফেন্দি। মাথার কাছে দেখলাম কর্নেল রত্নাকর গিরিকে। শুনলাম তাঁদের মুখ থেকে। আমাদের নিয়ে ওরা প্রায় পথেই নেমে পড়েছিল। এমন সময় সদর দরজায় বাধা দেন মিসেস এফেন্দি ও রত্নাকর গিরি। রাত তখন শেষ পর্যায়ে, হঠাৎ কী কারণে হোটেলের মুরগীর খাঁচা থেকে একটা মোরগ ডেকে ওঠে। সাথে সাথে সেই অপার্থিব ছায়া শরীরগুলো ভোর হওয়ার সঙ্কেত পেয়ে আমাদের ফেলে দ্রুত পালিয়ে যায় সাগরের দিকে। যদিও ভোর হতে তখনও অনেক বাকি।

পরদিনই তিরুপল্লীকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এসেছিলাম আমরা। এই ভয়ঙ্কর স্থানে আর নয়। প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসাটাই তখন আমাদের কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল।

এরপর থেকে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনলে আমার সারা শরীর হিম হয়ে আসে। আমি সহ্য করতে পারি না শব্দটাকে।

এহসান চৌধুরী

সেই কুটিরে একরাতে

সন্ধে হয়ে গেছে। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। ঝরঝর করে একটানা ঝরে চলেছে বৃষ্টি, যেন এর শেষ নেই। বাতাস বইছে শোঁ-শোঁ করে। একের পর এক খামারবাড়ি পাশ কাটিয়ে ওরচেস্টারশায়ারের আঁকাবাঁকা কাদাময় সরু গলিগুলো ধরে হাঁটছি আমি। কোনখানে যে থাকার জন্যে থামব সে ইচ্ছে মনে জাগল না। অযথা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেয়ার অস্বস্তিতে পড়তে হোক তা আমি চাই না। তাছাড়া আমার সামাজিক অবস্থান এখন যা তাতে যেকোন ভদ্রলোক আমার জবাব শুনে বিব্রত বোধ করবেন, চাইবেন আমাকে দূর করে দিতে, কিন্তু ভদ্রতা বোধের কারণে পারবেন না। সেটা তাঁর ওপরে একটা অত্যাচার হবে।

ভর সন্ধেয় পছন্দ মতো একটা কুটির চোখে পড়ল। বসতি থেকে অনেক দূরে, অযত্নে ঝোপঝাড় গজানো একটা বাগানের ভেতর কুটিরটা। কেমন যেন বিষণ্ণ, পরিত্যক্ত, অবহেলিত, একাকী, নির্জন। এমন একটা আস্তানাই তো এতোক্ষণ খুঁজছিলাম আমি। ঠিক করে ফেললাম, এখানেই রাত কাটাব।

সারাদিন আকাশ কেঁদেছে, পৃথিবীকে সিক্ত করেছে বৃষ্টি। সেই সঙ্গে ছিল তুমুল ঝড়ের দাপট। বৃষ্টি থেমে গেছে বটে, কিন্তু বাতাসের বেগ এখনও কমেনি, গাছের ডাল-পাতায় সরসর আওয়াজ করে বয়ে চলেছে একটানা। বাগানের বড় গাছগুলোর পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি বাতাসের নাড়া খেয়ে ঝরঝর করে ঝরছে এখনও, মনে হচ্ছে আসলে যেন বৃষ্টি এখনও থামেনি।

কুটিরের ছাদটা এখনও মজবুত দেখে মনে হলো ভেতরটা বসবাসের অযোগ্য হওয়ার কথা নয়। অন্তত বৃষ্টির পানি ভেতরে ঢুকে মেঝে ভিজিয়ে দেয়নি নিশ্চয়ই। থাকা যাবে। এই রাতে নির্জন একটা আস্তানা আমার খুবই দরকার। সারারাত এই বৃষ্টিতে কাক-ভেজা পোশাক পরে নিরাশ্রয়ের মতো ঘুরতে হলে মনে হলো মারাই পড়ব। একেবারে সর্বাঙ্গ ভিজে একসা হয়ে গেছি।

মনস্থির করতে দেরি হলো না। ঠিক করে ফেললাম লোকালয় থেকে দূরের এই কুটিরেই রাতটা কাটিয়ে দেব। রাস্তার দু'পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কেউ নেই কোথাও। ওরচেস্টারশায়ারের এদিকটা এমনিতেই একেবারে জনবিরল, তারপর বর্ষণক্লান্ত দিন শেষে নেমেছে আঁধার সন্ধ্যা। এখনও ঝড়ো বাতাসের দাপট কমেনি, কে বাইরে বেরোবে এসময়! কুটিরটা নির্জনই মনে হচ্ছে। রাতটা কাটালে কেউ যে আমার বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আনবে তা মনে হলো না।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতেই কোটের লাইনিঙের ভেতর থেকে লোহার একটা

শিক বের করে নিলাম। ওটা আর নিজের দক্ষতার সামান্য ব্যবহারেই কুটিরের তালাবদ্ধ দরজা খুলে ফেলতে পারলাম। ভেতরের ছিটকিনি দুটো খুলতেও তেমন ঝামেলা পোহাতে হলো না।

ঢুকলাম ভেতরে। ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। সোঁদা একটা গন্ধ ভাসছে ঘরের বদ্ধ বাতাসে। ওয়াটারপ্রুফের মোড়ক খুলে দেয়াশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বাললাম। সামান্য আলোই হলো। সে মৃদু আলোয় দেখলাম, সামনে একটা অন্ধকার প্যাসেজ। হাওয়ার ঝাপটায় কাঠিটা নিভে গেল। বিরক্ত হয়ে পেছনে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা। আমি চাই না আমার আগুন নিভে যাক, তাছাড়া কারও চোখে পড়ারও ইচ্ছে নেই আমার। অবশ্য এব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করলেও চলে। এই নির্জন এলাকায় দুর্যোগের রাতে কে আর আসবে!

আরেকটা কাঠি জ্বাললাম। সামান্য আলোয় অন্ধকার প্যাসেজের রহস্যময়তা যেন আরও বেড়ে গেল. এগোলাম প্যাসেজ ধরে। কয়েকটা কাঠি জ্বেলে পৌঁছে গেলাম পথের শেষে। সামনে ছোট একটা ঘর। কপালটা ভাল আমার, কোন ঝামেলায় যেতে হলো না, এঘরের দরজায় কোন তালা নেই। দরজার দু'পাট ভেজানো ছিল. ঠেলতেই খুলে গেল। প্রবেশ করলাম ভেতরে।

এঘরের বাতাসে সেই সোঁদা গন্ধটা নেই, বেশ স্বাভাবিক পরিবেশ। এক ধারে একটা জানালা। বন্ধ। ঘরের কোণে একটা মরচে ধরা পুরানো চুল্লি দেখলাম। খুশি হয়ে উঠলাম। অন্ধকার রাতে চুল্লি জ্বাললে ধোঁয়া কারও চোখে পড়ার কথা নয়। এসুযোগে ভেজা কাপড়গুলো আগুনের ওপর মেলে শুকিয়ে নেয়া যাবে।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি আছে, আগুন জ্বালতে সমস্যা হবে না। কিন্তু আগুন জ্বেলে রাখার মতো কাঠকুটো পাব কোথায়? চারপাশে তাকালাম পোড়াবার মতো কিছু পাবার আশায়। মেঝেতে কিচ্ছু নেই। দেয়ালের দিকে তাকাতেই সমস্যার সমাধানটা মাথায় খেলল। হাজার হোক এ কুটির তো আর আমার নয়। কোন ক্ষতি যদি হয়ই তো আমার হবে না। দেয়াল ওক কাঠের সুন্দর প্যানেলিং করা। ছুরি বের করে বেশ খানিকটা কাঠ কেটে দেয়াল থেকে নামালাম। ঘরের দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল, তাতে আমার কী? একরাতের জন্যে থেমেছি, কাল সকালে উঠেই নিজের পথে রওনা হয়ে যাব। কার কি ক্ষতি হলো অত ভাবলে চলে না।

চুল্লিতে ওক কাঠ দিয়ে দেয়াশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে আগুন জ্বাললাম। চমৎকার পুড়তে শুরু করল শুকনো ওক কাঠ। আগুনের পাশে বুট জুতো খুলে রেখে কাপড়চোপড় শুকাতে লাগলাম, সেই সঙ্গে চুল্লিতে চড়িয়ে দিলাম চায়ের পানি। চা তৈরির প্রয়োজনীয় সবকিছু আমার সঙ্গেই ছিল।

আরাম করে চা শেষ করলাম। ততোক্ষণে পোশাকও শুকিয়ে গেছে। ভাবলাম, এবার তাহলে শুয়ে পড়তে হয়। সারাদিনে সঙ্গে থাকা খাবার ফুরিয়ে গেছে, খাবার দাবার সঙ্গে কিছুই নেই যে উদরপূর্তি হবে। শক্ত কাঠের মেঝেতে

শুয়ে পড়লাম। খিদে সত্ত্বেও দু'চোখে ঘুম নেমে আসতে দেরি হলো না।

ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। কতোক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারি না। তবে বেশিক্ষণ নিশ্চয়ই নয়। চুল্লির আগুন এখনও জোরেসোরে জ্বলছে। তক্তার ওপর ঘুমিয়েছিলাম বলেই ঘুম ভাঙল কিনা ভাবলাম। এতোই খটখটে শক্ত মেঝে যে একটু নড়াচড়া করলেই হাড়ে ব্যথা লাগে। মাথা থেকে চিন্তা দূর করে আবার ঘুমাতে চেষ্টা করলাম।

চমকে উঠতে হলো একটু পরই। অন্ধকার প্যাসেজ ধরে একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে এঘরের দিকে!

এঘরে একটি মাত্র জানালা, সেটিও বন্ধ। দরজা মাত্র একটা, যেটা দিয়ে আমি ঢুকেছি। লুকাব যে তেমন কোন আলমারি বা কাবার্ড নেই ঘরে। স্পষ্ট বুঝলাম বাড়ির মালিক আসছে। পালানো দরকার। আরেকজনের বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে অপরাধ করেছি, এর কি জবাব দেব আমি লোকটাকে? কিন্তু পালাবার কোন পথ খোলা নেই। জানালাটাও ছোট, খুললেও গলে বেরোতে পারব না। না, লোকটার মুখোমুখি হয়ে এ বিদঘুটে সমস্যার একটা ভদ্রোচিত সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। যদি তা না পারি তাহলে কি ঘটতে যাচ্ছে সেব্যাপারে আমার সম্যক ধারণা আছে। লোকটা যদি আমার নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ করে তাহলে আবার ওরচেস্টার জেলে ফিরে যেতে হবে আমাকে। মাত্র দু'দিন হলো ওই জেল থেকে মেয়াদ পূরণ করে বাইরে এসেছি আমি। আবার ওখানে ফেরার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।

আগন্তুকের তাড়া নেই; ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পায়ে এগিয়ে আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে প্যাসেজে নিশ্চয়ই আলো পড়েছে, সে আলোয় সে এগিয়ে আসছে। হয়তো ভাবছে কে এলো হঠাৎ তার বাড়িতে।

দরজার পাল্লা খুলে গেল, প্রবেশ করল লোকটা, ভাব দেখে মনে হলো আমাকে যেন দেখেইনি। অবশ্য আমি এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছি, চট করে দেখার কথাও নয়। সোজা চুল্লির ধারে চলে গেল সে, বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে, হাত দুটো আগুনের ওপর দিয়ে গরম করতে করতে আগুনের ধারেই বসল। এখনও আমাকে দেখেনি।

একেবারে ভেজা বেড়ালের মতো কাতর অবস্থা লোকটার। এমনকি অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেও আমি অমন ভেজা ভিজিনি। সন্ধের পর আবারও শুরু হয়েছে বৃষ্টি, সে বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ভিজতে হয়েছে বেচারাকে। একটু করুণাই বোধ করলাম।

লোকটার পোশাক পরিচ্ছদ ভিজে একেবারে চুপসে গেছে। পুরানো জামা গায়ে, টপটপ করে মেঝেতে পানি পড়ছে ওগুলো থেকে। টুপি নেই লোকটার মাথায়। ভেজা চুল পাটের আঁশের মতো লাগছে দেখতে। চুল থেকে পানি ঝরছে, পড়ছে চুল্লির ওপর, আগুনের ভেতর পড়ে হিসহিস আওয়াজ করে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন ভূতুড়ে একটা পরিবেশ, যেন পৃথিবীর বাইরে কোথাও

আছি আমরা, নির্জন, একা, অসহায়–সবই আছে, কিন্তু কি একটা যেন নেই। সেটাই আসল। সেটার অনুপস্থিতিতে অসম্পূর্ণ লাগছে সব।

চেহারা দেখে লোকটাকে আইন মেনে চলা সুবোধ লোক বলে মনে হলো না। যেন আমার মতোই ভবঘুরে, পথের পথিক, যে এখনও নিজের গন্তব্য কোথায় তা জানে না। মনে হলো একই পথের পথিক আমরা। এই একাকিত্বময় প্রায়ান্ধকারে আলাপ জমানোর সুতীব্র ইচ্ছে হলো। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে, ভাই, আপনিও কী আমার মতো রাতে থাকার জায়গা খুঁজছিলেন?'

আমার দিকে ফিরে তাকাল লোকটা, চমকে গেছে বলে মনে হলো না। স্বাভাবিক স্বরেই বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। যা ঝড় শুরু হয়েছে! শুনতে পাচ্ছেন না বাইরে বাতাসের গর্জন?'

সায় দিলাম। 'তা শুনছি। মনে হয় সারারাত ধরেই চলবে।'

একমত হলো লোকটা, একটু অনুযোগ করেই যেন বলল, 'যা বলেছেন, খুবই খারাপ আবহাওয়া। তার ওপর খুব ভিজতে হয়েছে আমাকে। ঠাণ্ডা! কী ভীষণ ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে শরীরটা বরফ হয়ে গেছে।'

মাথা দোলালাম আমি। আসলেই শীত পড়েছে খুব। আমাকেও সায় দিতে হলো। 'আসলেই খারাপ আবহাওয়া। এই আবহাওয়ায় বাইরে বেরোনো...' অন্য একটা চিন্তা মাথায় আসায় বললাম, 'কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি...'

'বলুন?' আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জিজ্ঞেস করল আগন্তুক।

বিরক্ত হলেও বললাম, 'বুঝতে পারছি না এবাড়িটা পরিত্যক্ত কেন। আপনাকে তো এটার মালিক বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে এই বাড়ির মালিক কে? কেনই বা সে বাড়িটা ফেলে রেখেছে শুধু শুধু? ভাড়া দিলেও তো কিছু পয়সা আসত তার।'

বাইরে থেকে বাতাসের হুঙ্কার ভেসে আসছে, বাড়ছে ঝড়ের বেগ। জানালা খুলে দিলাম। দেখলাম, এবার বজ্রের খেলা শুরু হয়েছে। আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে সাদা-নীল বিদ্যুতের ঝিলিক, যেন একটা দ্রুত গতিশীল সাপ, এঁকে বেঁকে ছুটে আসছে পৃথিবীর বুকে ছোবল দিতে। বাগানের গাছগুলো ঝড়ের দাপটে বারবার মাথা নোয়াচ্ছে, হেলছে দুলছে; যেকোন সময় শিকড় উপড়ে মাটিতে আছড়ে পড়বে।

কড়! কড়! কড়াৎ! বাজ পড়ল। আওয়াজে মনে হলো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কাঁপছে ধরা, আতঙ্কে শিহরিত হচ্ছে প্রকৃতি, যেন করুণা চেয়ে বলছে, ধ্বংস করে দিয়ো না আমাকে।

'খ্যাঁক্কোর খ্যাঁক্কোর। উম্‌হুঁ! খুক্ খুক্ ! খেঁক্কোর খেঁক্কোর!'

নানা বিদঘুটে অদ্ভুত আওয়াজে কাশতে শুরু করল আগন্তুক। মিনিট দুয়েক পর শেষ পর্যন্ত কাশি থামলে বলল, 'এই এলাকায় এই বাড়ির চেয়ে সুন্দর বাড়ি এক সময় ছিল না, আমি জানি।' এমন দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক, যেন আমি তার কথাটার প্রতিবাদ করলে সে তর্ক করবে। আমি চুপ করে শুনছি।

'এখন আর কেউ এখানে থাকে না,' বলল লোকটা হতাশ সুরে। খানিকটা উষ্মাও যেন প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'আর এখন ভিখারিরাও এবাড়িতে একটুক্ষণ থাকতে চায় না।' ঘরের চারধারে একটু নজর বুলিয়ে বলল, 'ভিখারিরাও যদি থাকত তাহলে তাদের নোংরা কাপড় তো অন্তত দেখতে পেতেন। দেখতে পাচ্ছেন? নেই কিছু। কিচ্ছু নেই। ভিখারিরা পর্যন্ত এবাড়িতে আসে না।'

'কিন্তু কেন?' বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলাম না। 'খালি বাড়িতে ভবঘুরে কেউ আস্তানা গাড়বে না কেন?'

হাসল লোকটা। আবছা অন্ধকারে চিকচিক করে উঠল তার ঝকমকে সুন্দর দাঁত। জ্বলজ্বলে চোখে সোজা আমার চোখের দিকে তাকাল। 'বুঝলেন না? এ বাড়ির বদনাম আছে ভুতুড়ে বাড়ি বলে। জানের ভয় কার না আছে বলুন? আমি অবশ্য ওসব বিশ্বাস করি না।'

কৌতূহল বোধ করে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'একটু খুলে বলুন দেখি! আপনি বলতে চাইছেন বাড়িটা ভুতুড়ে?'

'সে এক দীর্ঘ কাহিনী, আপনার কি শোনার ধৈর্য হবে?'

'নিশ্চয়ই! আমি তো এসব কাহিনী শুনতে খুব পছন্দ করি! তবে আজ পর্যন্ত কোনওদিন ভূত দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলুন, আমার কপালে অবশ্য ঘটেনি।'

হাসল ভেজা লোকটা। 'আসলে বলার তেমন কিছু নেই। লোকে বলে এবাড়িতে প্রেত আছে। মাঝে মাঝে দেখা দেয় সে। কারেও কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু অতৃপ্ত আত্মার সঙ্গ কে চায় বলুন? ছোট্ট একটা কাহিনী। লোকে বলে এবাড়ির মালিক আত্মহত্যা করেছে। তার প্রেত আজও বাড়িটির কাছে ঘুরে বেড়ায়। আত্মহত্যা করেছিল লোকটা। সাঁতার জানত না, পুকুরে ডুবে নিজের জীবন শেষ করে দেয়। তার মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল তখন ফোলা লাশটা ভাসছে পুকুরের পানিতে।'

গা থেকে শুকিয়ে আসা কাদার চাপড়া শুকিয়ে গেছে। সেগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে শুরু করল আগন্তুক। আমার মনে হলো যেন আছাড় খেয়েছিল লোকটা রাস্তায় আসতে আসতে, আগুনের তাপে এখন বেশ স্বস্তি বোধ করছে। আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে এখনও তাকিয়ে আছি দেখে খুক খুক কাশল লোকটা, তারপর যে কাহিনী বলল তা আপনারা কেউ হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

'লোকটা মারা যাবার পরও অনেকে তাকে দেখেছে। গ্রামের মানুষ তো বলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এবাড়ি কি ওই পুকুরের কাছে গেলে আজও তাকে দেখা যায়, হাহাকার করছে সে। লোকে বলে প্রেতাত্মাটার জানা নেই যে তার মৃত্যুর আগেই তার স্ত্রী-পুত্র বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিল! ওরা অবশ্য ভুল বলে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, লোকটার মনে কোনও ভুল ধারণা ছিল না। আমি আয়নায় তাকে দেখেছিও, বিশ্বাস করুন বা না করুন। সব হারিয়ে পুকুরে ডুবে

আত্মহত্যা করেছিল লোকটা। তা সেই প্রেত নাকি কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। শুধু পছন্দ মতো সময় এবাড়িতে দেখা দেয়।'

নড়ে বসল লোকটা, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভেতরে পানি থাকায় তার বুট জুতোর ভেতর ছপছপ আওয়াজ হলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ঝড়ো বাতাস যেন বাড়িটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। হাজার হাজার ক্রুদ্ধ দানব যেন হুঙ্কারে হুঙ্কারে প্রকম্পিত করছে চারপাশ। চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, বাজের কড় কড় কড়াৎ আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠছে সব।

নীরবতা অসহ্য হয়ে ওঠায় আমি বললাম, 'আমাদের কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। ভূতের ভয়ে এই দুর্যোগের মাঝে বাইরে রাত কাটানো কোন কাজের কথা নয়।'

'সে তো বটেই! আমি আবার ভূতটুত হানা দেয়ার ওই গল্প বিশ্বাস করি না।'

'সে আমিও করি না,' হেসে বললাম। 'ভূত দেখেছে এমন কাউকে আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখিনি।'

আমার দিকে তাকাল আগন্তুক। বিষণ্ন, করুণ দৃষ্টি। 'দেখেননি? ভাবছেন কখনও দেখবেনও না? ভাল। কোন কোন লোক তো সারা জীবনেও ভূত দেখেনি। ভূতের উপদ্রব ছাড়াই দেশের গরীব মানুষগুলো যথেষ্ট কষ্টের ভেতর আছে।'

'আমার কাছে অবশ্য ভূত নয়, পুলিশ হচ্ছে আসল আপদ। পুলিশ আর গায়ে পড়া কৌতূহলী লোকের কারণেই আজকাল আমাদের মতো মানুষদের রাতে একটু আশ্রয় পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

লোকটার পুরানো পোশাক থেকে এখনও পানি ঝরছে। সে পানিতে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। কেমন একটা সেঁতসেঁতে সোঁদা গন্ধ আসছে নাকে। বুঝলাম লোকটার গা থেকেই ওই ভেজা গন্ধটা আসছে।

একটু অবাক হয়েই বললাম, 'এতোক্ষণ আগুনের ধারে বসে আছেন তারপরও আপনার কাপড় শুকাল না? মাথা আর গা থেকে তো দেখছি এখনও পানি ঝরছে! আর কখন শুকাবে আপনার শরীর!'

'শুকাবে?' আবার খুক খুক কাশল লোকটা, হাসার চেষ্টা করল। খসখসে শুকনো গলায় বলল, 'আমার শরীর শুকানোর কথা বলছেন? শুকাবে না, শুকাবে না কোনদিনই। কী করে শুকাবে, যাদের আমার মতো অবস্থা তাদের দেহ কোনদিনই শুকায় না। শীত-গ্রীষ্মে সব সময় এই একই অবস্থা, বুঝলেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়ান, এই দেখুন।'

লোকটা তার কাদামাখা হাত দুটো সোজা ঢুকিয়ে দিল চুল্লির ভেতরে। ভ্রূ কুঁচকে আগুনের দিকে চেয়ে আছে সে, যেন বদ্ধ এক উন্মাদের দৃষ্টি দেখলাম আমি তার চোখে। কী যেন আছে ওই চাহনির ভেতরে। অপার্থিব, অশুভ, অমানুষিক।

আসল ঘটনা এক পলকেই বোঝা হয়ে গেল আমার। মেরুদণ্ডের ভেতর শিরশির করছে টের পেলাম। এ-ই সেই ডুবে মরা বাড়ির মালিকের লাশ! জীবন্ত!

কখন আর্তনাদ করে উঠেছি নিজেও বলতে পারব না। বুটজুতো তুলে নিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে এলাম অভিশপ্ত ঘরটা থেকে।

অন্ধকার পথ পেরিয়ে বাগান পেরিয়ে কীভাবে যে রাস্তায় পৌঁছোলাম, বলতে পারব না। বাইরের এই মহা দুর্যোগ যেন এখন খুব কাঙ্ক্ষিত মনে হলো। বৃষ্টিকে মনে হলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কাদাময় পথটা যেন সোনায় মোড়া। বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখে ছুটে চলেছি। বজ্রের গর্জন যেন আমাকে এগিয়ে যাবার সঙ্কেত দিচ্ছে।

বৃষ্টিঝরা ঝড়ো রাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছি আমি তখন হানাবাড়িটাকে পেছনে ফেলে।

মূলঃ রিচার্ড হিউয়েস
আ নাইট অ্যাট এ কটেজ
রূপান্তরঃ কাজী মায়মুর হোসেন

ভুলের পরিণতি

নিজের জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে রহমতের। গ্রামের মধ্যে সেই একমাত্র কৃষক যার কোন অভাব নেই। গোলা ভরা ধান, খেত ভরা নানারকম শস্য, পুকুর ভরা মাছ–বিরাট বড় বাড়ির আঙিনায় রঙিন ফুলের মেলা, বাড়ির চারদিকে নানারকম ফলের গাছ, পিছনের জমিতে মৌসুমী তরকারির প্রাচুর্য, তেলও নিজের খেতের সর্ষে দিয়ে তৈরি–কিনতে হয় শুধু লবণ আর পরার কাপড়। হাঁস, মুরগী, দুগ্ধবতী গাভী, ছাগল–মোট কথা, অভাব শব্দটা ওর সংসারে নেই।

কৃপণও নয় সে, খুশি মনেই খাবার জিনিস থেকে শুরু করে টাকা পয়সা দিয়েও অনেককে সাহায্য করে। ব্যবহারও ভাল, তার প্রতি সবাই খুবই সন্তুষ্ট। শুধু সে নিজেই বুকে একরাশ অসন্তুষ্টি ও হতাশা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তার বাড়িতে কুকুর বেড়ালটাও আছে, নেই কেবল একটি সন্তান। আজ আট বছর বিয়ে হয়েছে। দিব্যি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দেখেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। বউটি লক্ষ্মীও খুব, মুখ বুজে স্বামীর সেবা থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ সেই করে। কাজের লোক আছে ঠিকই, তবু নিজ হাতে সংসারের কাজ করার মধ্যে আলাদা একটা তৃপ্তি আছে।

প্রথম প্রথম বউকে খুবই ভালবাসত রহমত। পছন্দমত নানারকম জিনিস কিনে আনত হাট থেকে। আদরে সোহাগে ভরিয়ে রেখেছিল বউকে। বউটিও স্বামী সোহাগিনী হয়ে গর্বে আনন্দে ঝলমল করত। প্রথম বিঘ্ন সৃষ্টি হয় বিয়ের

দু'বছর পর, বউ যখন মৃত সন্তান প্রসব করে। প্রথমে ভেবেছিল অনেকের দেরি হয় বাচ্চা হতে, এও হয়তো তাই; কিন্তু মরা ছেলে হবার পর খানিকটা হলেও বিগড়ে যায় মন। তাই বলে চেষ্টার ক্রটিও কম করে না। পানি পড়া, তাবিজ-কবজ, সাধু, ফকির থেকে কবিরাজ ডাক্তার সবই হয়েছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য।

এক দুই করে আট বছর যখন কাটল, ততদিনে বউয়ের ওপর থেকে মায়া মমতা ভালবাসা সবই উধাও হয়ে গেছে–মেজাজ হয়েছে খিটখিটে। এত বিশাল সম্পত্তি, ওর যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, কে দেখবে, কে খাবে এসব? এতদিন খারাপ ব্যবহারের চূড়ান্ত করেছে সে বউয়ের সাথে। আজ খাবার পর দুধ দিতে দেরি হওয়াতে দুধের গ্লাস তো আছড়ে ভেঙেছেই, সেই সাথে বউয়ের চুলের গোছা ধরে আচ্ছা রকম পিটিয়েছে। বেরিয়ে আসার সময় শাসিয়ে এসেছে, এক মাসের মধ্যে যদি কোন সুখবর না দিতে পারে তা হলে আরও তিনটা বিয়ে করবে ও। ছেলেপুলেতে ঘর ভরে যাবে, এটাই ও চায়।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হাটের পথে রওনা হয় রহমত। গতবারের তাগাদার টাকাটা আনতে হবে। পরিচিতদের সাথে কথা বললে মনটাও ভাল হবে।

টাকাগুলো সংগ্রহ করে সবার সাথে গল্প করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, খেয়াল হবার পর দেখে যে ওর গ্রামের লোকজন কেউ নেই, সবাই চলে গেছে।

যাকগে, ও নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। সাহসী বলে ওর যথেষ্ট সুনাম আছে। টাকাগুলো কোমরের থলিতে গুঁজে তার ওপর কষে গামছাটা বেঁধে নেয়, তারপর এক হাতে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে হাট থেকে বেরিয়ে পড়ে।

গ্রামের সীমানায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ও। একটি মেয়ে। সন্ধ্যার আবছা আঁধারে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ভাবার আগেই মেয়েটি প্রায় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ওকে চেপে ধরে বলল, 'আমাকে বাঁচান! আমাকে বাঁচান!

হতভম্ব রহমত অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে প্রশ্ন করে জানতে পারে, ওর নাম ময়না। ঘরে সৎমা, নানা রকম অত্যাচার করে। ভাল করে খেতে দেয় না, বাপও খেয়াল করে না। দুই গ্রাম পরে ওদের বাড়ি। আজ সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে এখানে, আজ রাতটুকুর মত আশ্রয় চেয়েছে কিন্তু কেউ ওর প্রতি দয়া করেনি।

ভাল করে চেয়ে দেখে রহমত ময়নাকে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা। সবচেয়ে সুন্দর ওর চোখ দুটি। আঁধারেও ঝকঝক করছে। ভালমন্দ চিন্তা করার শক্তি হারিয়েছে সে, ভর সন্ধ্যায় অচেনা একটি মেয়েকে সাথে নিলে তার পরিণতি কী হবে সেটা জানা ছিল না ওর। কাকে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামে, সেটাও বুঝতে পারে না। অনেক দেরিতে, প্রচুর খেসারত দিয়ে অবশেষে বোঝে সে, কিন্তু সেটা আরও পরের কথা।

বাড়িতে এসে হাঁকডাক শুরু করে রহমত, 'কই, কোথায় গেলি? মরলি

নাকি? জলদি বাইরে আয়।'

বিষণ্ন একটি মূর্তি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

ধমকে ওঠে রহমত, 'দেখছিস কী? এর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর। হাতমুখ ধোয়ার পানি দে। ভাল দেখে কাপড় বের কর। আমাদের ঘরে শুতে দিবি ওকে–তুই অন্য ঘরে শুবি, আর আমি বাইরের ঘরে থাকব। আজকের মত এই ব্যবস্থাই হবে–কালই ওকে বিয়ে করব আমি।'

সত্যিই পরদিন ময়নাকে বিয়ে করে রহমত। ময়নার আপত্তি হয় না। কেন হবে? আপনি থেকে যে সুখ এবং সুযোগ ও পেয়েছে, সেটা হারাবার মত বোকা ও নয়। অবশ্য খুবই ভাল মেয়ে সে, বড় বউয়ের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহারই করে। নিজে থেকেই সংসারের টুকটাক অনেক কাজ করে। রহমতকে ভালভাবেই বশ করেছে সে, শান্তভাবে বুঝিয়েছেও যে বড় বউ আগে এসেছে–তাই ওর অধিকারও বেশি। একদিন বড় বউয়ের কাছে একদিন ওর কাছে শোবে রহমত–কারও অধিকার সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নেয়া অন্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ব্যবস্থা রহমতের মনমত হয় না মোটেও, কিন্তু ময়নার ব্যবস্থার উপরও কোন কথা বলতে পারে না। বলবে কেমন করে, সে ক্ষমতা তার থাকলে তো! ময়নার ঘরে যেদিন শোবার কথা সেদিন রহমত আনন্দের সাথেই শোয়, কিন্তু বড় বউয়ের ঘরে আর রাত কাটায় না সে। ময়নার হাতে-পায়ে ধরেও একদিন পরপর ছাড়া শুতে পারে না সে, বাধ্য হয়ে অন্য ঘরেই নিজের শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

কোন প্রতিবাদ বা অভিযোগ বড় বউ করেনি। লাভ নেই জানে। তাই নীরবে চোখের পানি ফেলে। সে ব্যথার অশ্রু কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হয় একদিন।

একমাস পার হবার আগেই জানা যায় যে বড় বউ গর্ভবতী হয়েছে। খুশিতে পাগল হয়ে যায় রহমত–বড় বউকে আবার আগের মতই আদর যত্ন করে। তাই বলে ময়নাকে সে অবহেলা করে না। ময়না কিন্তু খুব খুশি বাচ্চা হবার সংবাদে। কোন হিংসা নেই ওর মনে, বরং বড় বউয়ের কী কী খেতে ইচ্ছে করে, জেনে নিয়ে নিজেই রান্না করে খাওয়ায়, আচার তৈরি করে নানারকম। গ্রামের লোকজন ময়নার আচরণে খুবই আশ্চর্য হয়, কারণ সতীনের প্রতি এমন ভাল ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না।

অগুনতি হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল ইত্যাদি রয়েছে রহমতের, সুতরাং কয়েকটা যদি হারিয়েও যায় কেউ খেয়াল করবে না। কিন্তু একদিন রহমতের রাখাল গ্রামের পাশের জঙ্গলে গরু ছাগল চরাতে যেয়ে একটি ঝোপের আড়ালে হাঁস-মুরগীর স্তূপাকার পালক দেখতে পায়–কিছু পুরানো, কিছু সদ্য খাওয়া। পালক দেখেই ও চিনতে পারে যে এগুলো রহমতেরই হাঁস-মুরগীর। তখনই ছুটে এসে খবর দেয় ওকে। এরপর আবিষ্কার হয় যে তিন চারটা ছাগলও বাচ্চা সহ উধাও। একটু খুঁজতেই সেগুলোর হাড়গোড়ও জঙ্গলে পাওয়া গেল।

ব্যাপারটা কী? রহমত তো নিজে থেকেই এটা ওটা মানুষকে দিয়ে দেয়, তা হলে ওর জিনিস কেউ চুরি করবে কেন? কে করবে? কিন্তু পালক ও হাড়ই তো প্রমাণ করে যে সেগুলো কেউ সরিয়েছে এবং খাবার পর জঙ্গলে ফেলে গেছে। অনেক চিন্তা করেও এর কোন সমাধান শুধু রহমত কেন, কেউই বের করতে পারে না।

এরপর শুধু রহমতের বাড়িতেই নয়, গোটা গ্রামেই একটা দুটো করে পশু চুরি হতে থাকে। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও চোর কিন্তু ধরা পড়ে না। সবাই যেখানে সবার চেনা, সেখানে এত নিখুঁত কাজ কার হতে পারে? কোনদিন এতটুকু শাক পাতাও যেখানে চুরি হয়নি আর আজ এগুলো কী ঘটছে? পাশের গ্রামের কারও কাজ নয়তো? গ্রামের পাশে যে জঙ্গল সেখানে বাঘ থাকার কথা ভাবা একটা হাস্যকর ব্যাপার। শেয়াল দু'চারটে থাকতে পারে, কিন্তু সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে দিনের পর দিন এতগুলো জানোয়ার হজম করা ওদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে চুরি হবার সময় একটা পশুরও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ওরা জানবে কী করে যে, যে চোর চুরি করে এগুলো, সে রাতের বেলা সবাইকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রেখেই করে। গ্রামের মানুষ এমনিতেই কমবেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়, তারপর যদি এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে থাকে তবে তো কথাই নেই। পাশের গ্রামের উপরও নজর রাখে কয়েকজন, কিন্তু রাতের বেলায় কয়েকটা কুকুর ছাড়া কোন মানুষকে বের হতে দেখে না। এরপর মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছায় সবাই যে ওদের গ্রামেই অশুভ কিছু আছে, যার দরুন এসব ঘটনা ঘটছে।

এরমধ্যেই রহমতের ঘরে ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। স্বামী-স্ত্রী তো খুশিতে পাগলই হয়। বেশি খুশি হয় ছোট বউ। বেশ যত্নও করে সে বাচ্চাটির। সংসারের কাজ আগের মত বড় বউই করে, যদিও রহমত এখন তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তবু অভ্যাস মত কাজ বন্ধ করে না বউ। ছেলের ভার ছোট বউ নেওয়াতে খুশি হয় সে। তবে রাতে নিজের কাছেই নিয়ে শোয়। এখনও আগের ব্যবস্থাই বজায় আছে শোবার। তবে রহমতের কাছে এই ব্যবস্থাটা এখন আর ভাল লাগে না। বাচ্চাটাকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করে না, আবার ময়নার অপছন্দের কোন কাজ করলে তার চেহারার পরিবর্তন ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয় রহমতকে। সুতরাং বাধ্য হয়েই নিজের ইচ্ছার প্রকাশ অন্তরেই চেপে রাখে।

বাচ্চাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী মশগুল থাকে, তাই খেয়াল করে না ময়নার ঝকঝকে চোখে হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠা পৈশাচিক দৃষ্টি। তবে একটা ব্যাপার অনেকে খেয়াল করে, দিন দিন রহমত শুকিয়ে যাচ্ছে! ওর সেই শক্তিশালী পেশীবহুল শরীর আর নেই। রহমত নিজেও বুঝতে পারে যে আগের মত শক্তি তার শরীরে নেই, দুর্বল লাগে খুব, মাঝে মাঝে মাথাও ঘোরে। ডাক্তার দেখিয়েও কোন লাভ হয় না—ভাল খাওয়াদাওয়া সত্ত্বেও ওর শরীর ধীরে ধীরে

শক্তিহীন হয়ে পড়ছে।

ছয়মাসের ছেলেটি রহমতের বেশ নাদুসনুদুস হয়ে উঠেছে। মার আদর-যত্নে বাচ্চাটি যেন টুসটুসে পাকা একটি আপেল। এতদিনের বঞ্চিত বাবা-মার ঘরে যেন একটুকরো চাঁদ এসে পড়েছে। বেশিদিন অবশ্য এই চাঁদের টুকরো ওদের বুক জুড়ে থাকে না। এক কাল রাত্রিতে সব শেষ হয়ে যায়।

সেদিন রহমতের ময়নার ঘরে শোয়ার পালা, তাই দরজা বন্ধ করে একাই বড় বউ বাচ্চাকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। সাধারণত মা জেগেই থাকে, কারণ দুধ খাওয়াতে হয়, ভেজা কাঁথা বদলে দিতে হয়। কিন্তু এই রাত্রিতে শোয়ার পরে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। কোনদিন এমন হয় না। বাচ্চা হবার পর থেকে রাত জাগা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আজ এমন লাগছে কেন, বড় বউ কিছুতেই বুঝতে পারে না। অনেক কসরত করা সত্ত্বেও মাঝ রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঘুম যখন ভাঙে তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। কী হয়েছে মনে করতে পারে না, তাই অভ্যাসমত বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে হাত বাড়াতেই ধড়মড় করে উঠে বসে। বাচ্চা কোথায়? ওর বুকের ধন তো নেই জায়গামত। পাগলের মত ঘরের মধ্যে খুঁজতে থাকে। খেয়ালও করে না যে দরজা খোলা। শেষে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে বুক ফাটা আর্তনাদ করে ওঠে।

রহমত ছুটে আসে। গ্রামের প্রায় সবাই দৌড়ে আসে। আসে না কেবল ময়না। তৃপ্ত মনে ও তখন সুখের ঘুমে আচ্ছন্ন। বাড়ির মধ্যে খুঁজে না পেয়ে সবাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সেই জঙ্গলেই পাওয়া যায় বাচ্চাকে। না। বাচ্চাকে নয়, তার হাড়গোড় আর মাথার খানিকটা অংশ।

পাগল হয়ে যায় রহমত ও তার বউ। ময়নার কান্না সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সবাই। এর একটা বিহিত এবার করতেই হবে। রহমতের অবস্থা শোচনীয়, তাই গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বী ভাল একজন ওঝার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। বিশেষ কাউকে জানান না ওঝার কথাটা, কারণ ব্যাপারটা এখন স্পষ্ট যে ওদের মাঝেই লুকিয়ে আছে সেই অশুভ শক্তি যে কিনা এতবড় সর্বনাশ করেছে। সাবধান হয়ে যেতে পারে সে, তাই গোপনীয়তা বজায় রেখে ভাল একজন ওঝার সন্ধান পান তারা দূর এক গ্রামে।

মন দিয়ে সব ঘটনা শোনার পর ওঝা খানিকক্ষণ চোখ বুজে চুপচাপ বসে থাকে, এরপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে যে ওদের গ্রামে কিছুদিনের মধ্যে নতুন কোন মানুষ এসেছে কিনা। ময়নার কথাটা জানাতে গিয়ে একজনের মনে পড়ে যে গ্রামের কে যেন একবার বলেছিল যে রহমতের ছোট বউ গ্রামে আসার পরেই এসব ঘটনার শুরু। কিন্তু তখন কেউ পাত্তা দেয়নি এই ভেবে যে ওর দ্বারা এসব ঘটলে তো অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত, কারণ রহমতই তো শোয় তার কাছে। এখন বউটির কথা উল্লেখ করায় ওঝা যে কথাগুলো বলে তাতে ওরা সবাই ভয়ে আতঙ্কে পাথরের মত জমাট হয়ে যায়। চিন্তিত মুখে জানায় ওঝা,

ওদের গ্রামটি এখন সাংঘাতিক এক বিপদের মধ্যে আছে। ময়না কোন মানুষ নয়, অত্যন্ত খারাপ ধরনের এক পিশাচিনী। প্রথমে রহমতকে কব্জা করেছে, তারপর আন্তরিক ব্যবহার দিয়ে গ্রামবাসীর বিশ্বাস অর্জন করার পর নিজের উপোসী পেট ভরিয়েছে। অশুভ প্রভাব বিস্তার করে সবাইকে রাতের বেলা ঘুমে আচ্ছন্ন করে রেখে একের পর এক পশু সাবাড় করেছে, যার জন্যে রহমত এবং ওরা কেউ কোন আওয়াজ পায়নি বা কী ঘটেছে তা আন্দাজ করতে পারেনি। রহমতের শক্তিহীন হবার কারণও এই ডাইনীর সাথে মিলিত হওয়া।

শুকিয়ে যাওয়া গলা দিয়ে কোনমতে আওয়াজ বের হয় ওদের। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী? মলিন মুখে ওঝা জানায়, ওর সীমিত শক্তিতে এতবড় অশুভ ক্ষমতার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। ও গ্রামে পা দেবার সাথে সাথে পিশাচটি টের পেয়ে যাবে। তাতে নিজের তো বটেই, গ্রামের একটি মানুষেরও আর অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করে অবশেষে ওঝা জানায় যে উপায় একটা বের করেছে সে। কিন্তু সেটা একমাত্র রহমতই পারবে। ওকে নিয়ে আসতে হবে তার কাছে। তবে সাবধান, এমন কোন আচরণ যেন ওরা না করে যাতে ময়নার মনে কোন সন্দেহ জাগে। রহমতকেও কিছু বলা যাবে না, ও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং খুব কৌশলে তাদের রহমতকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। দেরি করা চলবে না কোনমতে।

মনের মধ্যে নিদারুণ ভয় নিয়ে কোনমতে ওরা রহমতের কাছে আসে। ময়না তখন ওর কাছেই দাঁড়ানো। ভুলেও ওর দিকে ভয়ে তাকায় না তারা। মুখে স্বাভাবিক হাসি নিয়ে রহমতকে ওদের সাথে খানিকটা বেড়িয়ে আসার জন্য অনুরোধ করে, বোঝায় যে এতে ওর মনটা খানিক ভাল হবে। তারপর একজন ময়নার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ছোট বউ রহমতকে একটু ঘুরিয়ে আনি। সারাক্ষণ তো ঘরেই বসে আছে? বাইরের আলো হাওয়ায় ঘুরে এলে মনটা ভাল হবে। তুমি বড় বউকে একটু দেখে রেখো।'

হাসিমুখে সায় দেয় ময়না। ওর সামনে থেকে সরে এসে সবাই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

সব শুনে রহমতও ভয় পেয়ে যায়। এই সরল সুন্দর মেয়েটি একটা দানবী–ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এর সাথেই রাতের পর রাত কাটিয়েছে! থরথর করে হাত পা কাঁপতে থাকে। ওর অবস্থা দেখে ওঝা বলে, 'বাবা, তুমি যদি ভয় পেয়ে যাও তবে তোমার পরিবারসহ গোটা গ্রামটাই যে শেষ হয়ে যাবে। আর কেউ নয়, শুধুমাত্র তোমার হাতেই আছে সবার প্রাণ রক্ষার উপায়। তা ছাড়া, ছেলের প্রতিশোধ নেবে না তুমি?'

বাচ্চার কথায় প্রাণপণে নিজেকে সামলায় রহমত, তারপর বলে, 'বলুন কী করতে হবে।'

হাসি মুখে ওঝা বলে, 'না, আর কাউকে নয়, একমাত্র তোমাকেই জানাব কী করতে হবে। কারও জানা চলবে না, বিপদ বাড়বে তাতে।'

এরপর আড়ালে নিয়ে রহমতকে সব বুঝিয়ে দেয় যে কী করতে হবে। সেই সাথে খানিকটা পানি পড়া খাওয়ায় ওকে, যাতে মনের মধ্যে ভয়ের ভাবটা না থাকে। ওকে স্বাভাবিক থাকতেই হবে, ভয় পাওয়া চলবে না কিছুতেই, তা হলে সব শেষ। এও বলে দেয় যে কাজ হওয়া মাত্র যেন একটুও দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে চলে আসে। ব্যস, তারপর বাকি কাজ ওঝাই করতে পারবে।

রাতের বেলা খাবার পর পান চিবাতে থাকে রহমত। ময়না এসে ঘরে ঢোকে। ওকে দেখে হাসি মুখে রহমত বলে, 'কী ব্যাপার, ময়না পাখি? শুতে যাওনি এখনও? কিছু বলবে?'

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ময়না। 'কী ব্যাপার মানে? শুতে এলাম আর তুমি ব্যাপার কী জানতে চাইছ?'

ময়নার চেয়েও বেশি অবাক হয় রহমত। 'তুমি তো কালই শুলে এ ঘরে। আজ বড় বউয়ের পালা না?'

'আমি কাল শোব কেন! বড় বউ তো শুয়েছে. আজ আমারই তো শোবার কথা।'

অর্থপূর্ণ হাসি হাসে রহমত। 'কী ব্যাপার? কাল শুয়েও মন ভরেনি, তাই আজ ভুলে যাবার ভান করে শুতে এসেছ? দেখো বউ, বড় বউয়ের মনটা ভাল নেই, ওর পালা যখন তখন আজ এখানেই শুতে দাও ওকে।'

রেগে আগুন হয়ে যায় ময়না। 'কিছুতেই আমি কাল শুইনি এখানে। ভুলব কেন? মিথ্যে বলছি আমি?'

এবার রাগ রাগ মুখ করে রহমত বলে, 'নাহ্, সবার সাথে তুমিও পাগল হয়ে গেছ। কাল কত রাত জেগে গল্প করলে। আমার মন ভাল করার জন্য কত কীই না করলে। হাট থেকে লাল চুড়ি আনতে বললে। তোমাকে নিয়ে একদিন দূরের নদীটা থেকে ঘুরিয়ে আনতে বললে। এখন সব ভুলে বসে আছ? না, ময়না এটা ঠিক নয়—বড় বউকে একটু সুযোগ দাও।'

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে ময়না ওর দিকে। 'মিথ্যে বলছ না তো? সত্যিই আমিই এসেছিলাম?'

করুণ মুখে রহমত বলে, 'ময়না, তুমিও যদি এসময়ে আমাকে ভুল বোঝ, তবে কার কাছে যাব আমি? বড় বউ তো পাগল হয়ে গেছে, তুমিও যদি আমাকে...'

তখন খানিকটা শান্ত হয় ময়না। মনে মনে ভালই জানে যে ও কাল আসেনি, এবং রহমতও মিথ্যে বলছে না—নিশ্চয়ই ওর মত অন্য কিছু রহমতের ওপর নজর দিয়েছে। নিমেষে ছুটে এসে রহমতের হাত ধরে। 'জলদি ওঠো, চলো আমার সাথে!'

অবাক হয় রহমত। মনে মনে অবশ্য পুলকিত হয়—বুঝতে পারে, ওদের আকাঙ্ক্ষিত সেই ক্ষণ উপস্থিত। এসময়ে কোনরকম ভুল করা চলবে না। বেজার মুখে বলে, 'কোথায় যাব এই রাতের বেলা? কাল সকালে যেও যেখানে খুশি।'

'আহ্, দেরি কোরো না। ভরসা রাখো আমার ওপর। কোন প্রশ্ন কোরো না!' অস্থির হয়ে ময়না প্রায় টেনে বার করে আনে স্বামীকে ঘরের বাইরে।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। কাপড়টা সামলাতে দাও। বড় বউকেও একটা খবর দিয়ে আসি।' কিন্তু আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের গতিতে রহমতের হাত ধরে ছুটে চলে ময়না।

কত গ্রাম, জঙ্গল, নদী পার হয়ে ছুটে চলেছে ওরা, রহমত কিছুই বুঝতে পারে না। অবশেষে গভীর একটি জঙ্গলের সামনে এসে ময়না থামে। 'শোনো, এই জঙ্গলের মধ্যে সোজা ঢুকে যাবে, ডাইনে বাঁয়ে থামবে না। কিছুদূর সোজা যাবার পর খুব প্রাচীন একটি বট গাছ দেখতে পাবে, সেটাকে বাঁয়ে রেখে মোড় নেবে। কিছুদূর গেলেই বিরাট আর একটি গাছ দেখতে পাবে, গাছের চারপাশে কতগুলো লতা দেখতে পাবে, সেগুলো থেকে অদ্ভুত একটি গন্ধ পাবে। সুতরাং চিনতে অসুবিধে হবে না। সেই লতা শিকড়সুদ্ধ একটা তুলে নিয়ে এসো।'

রহমত ভয় পাবার ভান করে। 'আমি এই জঙ্গলে একা যাব কী করে। আমার ভয় করে। তুমিও চলো সাথে।'

'না, না, আমি যেতে পারব না। তুমি একাই যাও। কোন ভয় নেই...'

ময়নার নির্দেশ মত লতাগাছগুলোর সন্ধান পেয়ে যায় ও। অপূর্ব সুন্দর সুগন্ধ আসছে সেগুলো থেকে। একটা নয়, দু'হাতে যতগুলো পারে, শিকড়সুদ্ধ ছিঁড়ে নেয়। তারপর জঙ্গলের বাইরে এসে ডাকতে থাকে ময়নাকে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে ময়নার গলার আওয়াজ পায় রহমত, 'আমি এখানে, জলদি এসো!'

'আরে, আগে দেখে নাও এই লতাই কিনা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই আছে। কিন্তু তুমি আর কাছে এসো না। চাঁদের আলো আছে, আমার পেছন পেছন চলে এসো।'

রহমত আর একটি কাজ করেছিল ওঝার কথামত, বড় বউকে এক ফাঁকে বলে রেখেছিল যে রাতের বেলা যেন খেয়াল রাখে। ময়নার সাথে ওকে বের হতে দেখলেই যেন দেরি না করে তক্ষুণি গ্রামের সীমানায় চলে যায় ও, সেখানে আরও অনেকে থাকবে। তাই করেছিল বড় বউ, বিনা প্রশ্নে স্বামীর আদেশ মত গ্রামের বাইরে চলে গিয়েছিল।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয় ময়না, কী হলো জানতে চাইলে সে জানায় যে লতাটি অন্য ঘরে রেখে তারপর যেন এ ঘরে আসে রহমত।

এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রায় দৌড়াতে থাকে রহমত গ্রামের সীমানার উদ্দেশ্যে। ওকে দেখেই ওঝা বুঝতে পারে যে সফল হয়েছে সে। হাত পাতে ওর দিকে। 'দেখি কী পেলে।' লতাগুলো হাতে নিয়ে হাসিতে মুখ ভরে যায় ওঝার। খুশিতে বলে ওঠে, 'ওষুধ আমি পেয়ে গেছি, আর ভয় নেই। এখন জলদি করতে হবে।' কয়েকটি লতা কয়েকজন লোকের হাতে দিয়ে নির্দেশ দেয় খুব তাড়াতাড়ি যেন শিকড়সুদ্ধ লতাগুলো গ্রামের চার কোনায় ভাল করে মাটিতে

পুঁতে ফেলে–একটুও যেন দেরি না হয়, কারণ সময় খুব কম। তারপর রহমত ও তার বউ এবং বাকি সবার হাতে একটু একটু লতা ছিঁড়ে দেয়, বাকিটা নিয়ে রওনা হয় গ্রামের দিকে। ততক্ষণে মাটিতে লতাগুলো পুঁতে রেখে অন্যান্যরাও চলে আসে।

রহমতের আসতে দেরি দেখে ময়না দরজা খুলে এঘর ওঘর খুঁজে কাউকে না পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় রহমত সহ গ্রামের প্রায় সবাই উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই ওঝাকে দেখতে পেয়ে বিকট চিৎকার করে ওঠে। কী ব্যাপার বুঝতে আর বাকি থাকে না কিছুই। স্বমূর্তি ধারণ করে ছুটে আসতে থাকে ওদের দিকে। ওঝা একপাশে সবাইকে সরিয়ে দেয়, হেসে ওঠে। 'যাবি কোথায়? শয়তানি, খেলা শেষ। পালাবার সব পথ বন্ধ,' এই বলেই খানিকটা পড়া পানি রাক্ষসীর গায়ে ছুঁড়ে মারে। আবারও চিৎকার করে ওখানেই আটকে যায় সে। ওর আসল চেহারা দেখে অনেকে সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যায়। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে রহমত ও তার বউ এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি দেখতে থাকে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে ডাইনীটা। 'শয়তানের বাচ্চা, মামুলি একটু পানি দিয়ে কতক্ষণ আটকে রাখবি আমাকে? এই দেখ, শেষ হয়ে যাচ্ছে তোর পানির ক্ষমতা। আর অল্পক্ষণ, তারপর আগে তোর ঘাড় মটকে রক্ত খাব, এরপর ওই হারামীর বাচ্চা ও তার বউকে শেষ করব!'

শয়তানি হাসি হেসে ওঝা বলে, 'জানি তোর বদ্‌বুদ্ধি ও ক্ষমতার কাছে আমি নিতান্তই বাচ্চা, কিন্তু নিজেকে শেষ করার উপায় নিজেই করে দিয়েছিস। আমাকে শেষ করবি? আয় দেখি কে কাকে শেষ করে!' এই বলে লতাগুলো বের করে সে। দেখেই আর্তনাদ করে ওঠে ময়না। পালাতেও চেষ্টা করে, কিন্তু গ্রামের চারপাশে রেখে দেয়া লতাগুলোর প্রভাবে কোথাও যেতে পারে না। পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করে সে, আর ওঝা শুরু করে তার কাজ–লতাগুলো একটি মালসায় ভরে উঠানের মাঝখানে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে লতাগুলো থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। মায়াবী সুগন্ধী ধোঁয়া। আর কোন লাভ হবে না, বোঝে পিশাচিনী। ক্ষমতাও শেষ ওর। ছোটাছুটি বন্ধ হয়ে যায়। নড়বার শক্তি থাকে না। সকলের ভয়ার্ত চোখের সামনে ধোঁয়া ওটার গায়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বিভীষিকাটি খুব ধীরে ধীরে মোমের মত গলে যেতে থাকে, ভয়াবহ চেহারায় ফুটে ওঠে যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি–

অবশেষে সব শেষ হয়ে যায়। ধোঁয়ার সাথে সাথে গলে মিশে যায় পিশাচীর শরীর–কোন চিহ্নমাত্র আর থাকে না। ওঝা বাকি লতা থেকে রহমত ও তার বউয়ের জন্যে তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেয়। বাকি লতা রহমতের বাড়ির মধ্যেই পুঁতে রাখে। যাবার সময় বলে যায় যে গ্রামটি এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত, আর কোন ভয় নেই। তবে একটা বছর যেন রহমত সাবধানে থাকে, তাবিজ গলা থেকে খুলতে মানা করে। হাটেও বেশি দেরি করতে নিষেধ করে–সন্ধ্যা

যেন কিছুতেই না হয়। অন্য সবাইকেও সাবধান করে দেয়, আর কোনদিন যেন অচেনা কাউকে গ্রামে ঠাঁই না দেয়, বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় যেন কিছুতেই অচেনা অজানা কারও সাথে কথা বলতে না যায়।

শান্তির ছায়া নেমে আসে রহমতের বাড়িতে। নিজের ভুল বুঝতে পারে সে। বউকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানিতে ভেসে মাফ চেয়ে নেয়। ঘর ভরা না হলেও এরপর চারটি ছেলেমেয়ে হয় বউয়ের। অতি সুখে ও শান্তিতে রহমত স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জীবন কাটাতে থাকে।

নাজনীন রহমান

রাতে

সূর্য ডুবে শুরু হলো আরেকটা গোধূলি। পশ্চিম আকাশে এখন গোলাপি রঙের ছোপ, তবে মৃদু সেই আলোর একফোঁটাও ঢুকছে না জাঁকজমকপূর্ণ বেডরুমটায়।

ক্লডিয়া ঝুঁকে আছে রাইটিং-টেবিলটার দিকে। মুখ ঢেকে থাকা লম্বা চুলগুলো ব্রাশ করে চলেছে দ্রুত হাতে। অয়েল ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে তার চুল।

আরেক পাশে বসে আছে গারল্যান্ড। তার খাটো, সোনালি চুলগুলো সে-ও ব্রাশ করে চলেছে দ্রুতহাতে। 'তবু ভাল যে তোমার মত অত লম্বা লম্বা চুল আমাকে সামলাতে হয় না,' হাসল সে।

'বাজে বোকো না তো,' হাসল ক্লডিয়া। 'তোমার চুলও কাউকে পাগল করার জন্যে যথেষ্ট।'

চুল ঠিক করবার পর রূপালি চোখে গাঢ় নীল মাসকারা লাগাল ক্লডিয়া, আর গারল্যান্ড তার ফ্যাকাসে চোখে লাগাল বাদামি মাসকারা। তারপর দু'জনেই ঠোঁট লাল টুকটুকে করে ঠোঁট টিপে টিপে মসৃণ করতে লাগল লিপস্টিক।

সাজগোজ শেষ করে ক্যাঁচক্যাঁচ করা সিঁড়ি বেয়ে নামল তারা বড় পার্লারে। রাত নামছে সন্তর্পণে। পুরানো অয়েল ল্যাম্পগুলোতে তেল ভরল ওরা। দেখতে দেখতে চকচক করে উঠল ফ্লোরবোর্ডগুলো হলুদ আলোর ঝিলিকে। গারল্যান্ড জ্বালিয়ে দিল সুগন্ধী দু'টো মোমবাতি।

চারপাশে তাকাল তারা সপ্রশংস দৃষ্টিতে। ক্লডিয়ার পরনে লাল সাটিন; গারল্যান্ডের গাঢ়, উজ্জ্বল নীল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে একে অপরের খুঁত খুঁজতে লাগল তারা, কিন্তু শেষমেশ পেল না কিছুই।

'আমি বাইরে যাব,' বলল গারল্যান্ড। ঝুঁকে নিজের স্লিপারের দিকে তাকাল। খুব বড় নয় তার হিল। 'খুব বেশি হাঁটার ইচ্ছে নেই, শিগ্‌গিরই

ফিরব।'

'বাইরে হেঁটে লাভ নেই,' বলল ক্লডিয়া। 'এদিকে তেমন একটা কেউ আসে না। সত্যি, অনেকদিন হয়ে গেল কারও সঙ্গ পাইনি আমরা।'

'হয়তো আমি বেশি আশা করে ফেলছি,' হাসল গারল্যান্ড। ঝিকমিক করে উঠল তার চোখজোড়া, যেন গোপন কোন আনন্দে। 'তবে মন বলছে, আজ কাউকে নিয়েই ফিরব।'

'আমি এখানেই থাকি,' বলল ক্লডিয়া।

কাঠের বড় দরজাটা লাগিয়ে, দালানের সারির ভিতর দিয়ে এগিয়ে গারল্যান্ড গিয়ে দাঁড়াল ফ্ল্যাগস্টোন নির্মিত পথটায়। দু'পাশের গাছগুলো ভরে গেছে আইভি আর হানিসাকলে। শরৎকালীন পাতায় ঢেকে গেছে ওকগাছ। সন্তর্পণে পা বাড়াল গারল্যান্ড।

দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল একটা প্যাঁচা। হাসল গারল্যান্ড মুখ টিপে, গভীর শ্বাসে টেনে নিল রাতের বাতাস।

বৃষ্টির ফোঁটার মত ঝরছে গাছের পাতা। আকাশে ছুটে চলেছে যাযাবর মেঘের রাশি। দু'পাশের পুরানো দালানগুলোয় এসে পড়েছে চাঁদের আলো। বড় বড় সব ভিকটোরিয়ান দালান। সেগুলোর কোনও জানালায় কোনও আলো নেই। এখন প্রায় পরিত্যক্ত শহরের এই প্রান্ত ছিল এলারি কলেজের জন্য বিখ্যাত।

হঠাৎ গারল্যান্ডের কানে এল মানুষের স্বর। লম্বা দু'জন যুবক এদিকেই আসছে। চাঁদের আলোয় দেখল সে ভাল করে। সুদর্শন দুই যুবক, ফিটফাট পোশাক, গড়ন অ্যাথলিটদের মত। এরকম যুবক সে বেশ কিছুদিন দেখেনি। সারা শরীরে কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করল গারল্যান্ড।

যুবক দু'জন প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, তাদের কথা শুনতে পেল সে।

'কলেজে পড়তে আমার হুইট চাচা এদিকে আসত,' বলল একজন। 'চাচা বলেছে, এই জায়গাটার নাম নাকি পিঙ্ক হিল। এখানে আনন্দ পাবার মত অনেক জিনিস আছে।'

ঘুরল সে বাড়ি ফিরবার জন্য। দ্রুত পা বাড়াল। বুঝতে পারল না, তার খুশি হওয়া উচিত নাকি বিষণ্ন। তবে নিজের শরীর আর চেহারার উপর তার যথেষ্ট ভরসা আছে। দু'জনকে পেরিয়ে যাবার মুহূর্তে কথা বলল সে, 'হাই।'

লম্বা একজন, মুখে দাড়ি, লাজুক ভঙ্গিতে বলল, 'রাতটা খুব সুন্দর, তাই না?'

গারল্যান্ড হাসল। 'কিন্তু বাতাস ভীষণ ঠাণ্ডা। এক্ষুনি বাড়ি ফিরব আমি, ফিরে হট চকোলেট বা চা, তৈরি করব কিছু একটা।'

আবার পা বাড়াল সে। ঢেউ উঠল নিতম্বে।

যুবক দু'জন তাকে অনুসরণ করছে। কথা বলছে দাড়িঅলা যুবক, শুনবার জন্য কান পাতল গারল্যান্ড।

'আমরা অভিজ্ঞতা লাভের জন্যেই এদিকটায় এসেছি।'

বেশি শক্ত-সমর্থ, অ্যাথলিটের মত যুবকটা কী যেন বলল নিচু গলায়, শুনতে পেল না গারল্যান্ড। তবে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে একমত হলো বলেই মনে হলো।

পা বাড়াল সে সাবধানে। পেভমেন্টের সিমেন্ট ফেটে ফেটে গেছে। আর কোনও সন্দেহ নেই, যুবক দু'জন অনুসরণ করছে তাকে। আবার উত্তেজনার একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল তার সারা শরীরে। আবার ঢেউ উঠল তার নিতম্বে। জানে সে, নিতম্বে কতখানি ঢেউ তুলতে হয় পুরুষকে ঘায়েল করবার জন্য। ফ্ল্যাগস্টোনের পথ পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে বাড়ির দরজায়।

'আজ আমরা সঙ্গ পাব, ক্লডিয়া,' বলল সে।

চারপাশে দ্রুত একটা নজর বুলিয়ে ক্লডিয়া হাসল। 'বলো।'

'দু'জন সুন্দর যুবক, আমার পিছু পিছু আসছে। একজনের মাথায় ঝলমলে চুল, ফুটবলারদের মত শরীর। আরেকজন লম্বা, মুখে দাড়ি, অভিজাত চেহারা। আমাদের কিন্তু ওদের ভালভাবে আপ্যায়ন করতে হবে।'

'একবোতল পোর্ট আছে, আর আমার তৈরি পনিরের বিস্কুট।' বাতির আলোয় টেবিলটার উপর চোখ বোলাল ক্লডিয়া। 'অতএব ভাবনার কিছু নেই।'

বাইরে থেকে তাদের কানে ভেসে এল পদশব্দ আর ফিসফাস।

'ওরা কিন্তু সত্যিই সুন্দর,' বলল গারল্যান্ড।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরেই দরজায় টোকার শব্দ।

'চলো,' বিজয়ীর দৃষ্টিতে ক্লডিয়া তাকাল গারল্যান্ডের দিকে। 'কোনওরকম উল্টোপাল্টা করবে না।'

এগোল সে দরজার দিকে, তার লাল গাউন সেঁটে আছে ভরাট নিতম্ব আর সরু কোমরে।

যুবকদের সঠিক বর্ণনাই দিয়েছে গারল্যান্ড। চমৎকার শার্ট, প্যান্ট তাদের পরনে। লম্বা যুবকের মুখে নিখুঁত ছাঁটের দাড়ি। মেধাবী চেহারা। অন্যজন মাঝারি উচ্চতার, চওড়া কাঁধে শক্তিশালী পেশীর আভাস। নিঃসন্দেহে বলা যায়, দু'জনেই এলারবি কলেজের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট।

'গুড ইভনিং, জেন্টলমেন,' মোহিনী হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল ক্লডিয়া।

'গুড ইভনিং, ম্যাম,' বলল মাঝারি উচ্চতা। ওটা গারল্যান্ডের জন্য, ভাবল ক্লডিয়া মনে মনে। আর তার জন্য—লম্বাটা।

'আমরা ভেবেছিলাম—' বলল লম্বা, তারপর খানিকটা ইতস্তত করে থেমে গেল।

'হাঁটতে হাঁটতেই আমরা এদিকটায় এসে পড়েছি,' বলল অন্যজন। 'আমার নাম গাই, আর ওর ল্যারি। আমরা—আমরা ছাত্র।'

'আমরা নতুন ছাত্র,' বলল ল্যারি। 'এলারবির।'

'হুঁ,' বলল ক্লডিয়া। 'তোমরা ভেতরে আসবে না?'

'অবশ্যই, ম্যাম,' গাইয়ের গলায় কৃতজ্ঞতার সুর। ভেতরে ঢুকে দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইল পাশাপাশি। মুখে অবিশ্বাসের হাসি। ধীরে দরজা বন্ধ করে দিল ক্লডিয়া।

কৌতূহলী চোখে চারপাশটা দেখল ল্যারি। 'সুন্দর জায়গা এটা,' বলল সে। 'চমৎকার। একদম–মানে, পুরনো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মত।'

'ধন্যবাদ,' হাসল গারল্যান্ড। 'এসো, এই সোফায় বসো।'

ইতস্তত করল সে, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পা বাড়াল সে সোফার দিকে। পায়ে তার দামী, ঝকমকে বুট। গারল্যান্ড আর সে বসে পড়ল একত্রে, গাইয়ের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ক্লডিয়া।

'তোমাকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে,' বলল সে, রূপালি চোখে নক্ষত্রের আগুন। 'খুব পরিচিত একজন, ফুটবল খেলত সে জাতীয় দলের পক্ষে।'

'হয়তো সব ফুটবলারের চেহারা একই রকম,' হাসল গাই।

ওদিকে গারল্যান্ড হাসল ল্যারির পাশে বসে। 'এই, পোর্ট খাবে একগ্লাস? খুব ভাল এটা।'

'আমিই দিচ্ছি,' বোতল থেকে পোর্ট ঢালবার সময় হাত সামান্য কাঁপল ল্যারির। 'এই যে।' গ্লাস বাড়িয়ে দিল সে।

'না, এটা তোমার জন্যে,' বলল গারল্যান্ড। 'আমি পরে নেব।'

চুমুক দিল ল্যারি। 'অসাধারণ।'

'হ্যাঁ। বন্ধুদের আমরা সেরা জিনিসটাই দিই।'

'এই আতিথেয়তার কথা আমরা মনে রাখব, ম্যাম,' আবার চুমুক দিল সে পোর্টে।

'তুমি আমাকে গারল্যান্ড বলে ডাকতে পারো।'

ক্লডিয়া গাইকে বসিয়েছে খুব নরম একটা হাতলঅলা চেয়ারে, আর নিজে বসেছে সেটার হাতলের উপর। ফিসফাস করছে তারা চাপা হাসির ফাঁকে ফাঁকে।

'ল্যারি,' বলল গারল্যান্ড, 'আমার কিন্তু সত্যিই মনে হচ্ছে, তুমি এদিকে অনেক বার এসেছ।'

'না, তুমি ভুল করছ,' বাদামি চোখজোড়া এখন তার গারল্যান্ডের উপর নিবদ্ধ। 'এদিকটায় আমি কখনোই আসিনি।'

আরও কাছে সরে এল গারল্যান্ড। 'তোমার গল্প বলো।'

'আমার কোনও গল্প নেই। সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি।'

'গল্প তো থাকতেই হবে।' আরও কাছে সরে এল গারল্যান্ড। 'তোমার ক্যাম্পাসের গল্পই না হয় বলো।'

তার হাতে হাত রাখল সে। সঙ্গে সঙ্গে গরম হাতে সেই হাত চেপে ধরল ল্যারি। পেলব হাতে তার আঙুলের উপর টোকা দিতে লাগল গারল্যান্ড।

অপর প্রান্তে ক্লডিয়া ততক্ষণে গাইয়ের কোলের উপর বসে পড়ে তার কান

ধরে টানছে। হাবভাবে মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যেই বেশ জমে গেছে দু'জনে।

'সুন্দর বাড়ি এটা,' বলল ল্যারি। 'সত্যিই সুন্দর।'

এখনই আসবে প্রশ্নটা, ভাবল গারল্যান্ড। এরকম প্রশ্ন যে এমন জনমানবহীন একটা জায়গায় তারা দু'জন মাত্র সুন্দরী মেয়ে কীভাবে থাকে। সৌভাগ্যের বিষয়, ল্যারি তেমন কোন প্রশ্ন করল না। তার একটা হাত টেনে নিয়ে গারল্যান্ড রাখল নিজের নরম স্তনের উপর।

'ভাল লাগছে?' বলল সে ফিসফিস করে।

এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে, নিশ্চয় বুঝতে পারল সে। কিন্তু কোনওরকম বাড়তি আবেগ না দেখিয়ে দেখতে লাগল সে ঘরের চারপাশ।

'এসো আমার সঙ্গে,' বলল গারল্যান্ড।

উঠে পড়ে সে টানল তার হাত ধরে। ল্যারি হাসল। ক্লডিয়া আর গাই এখন খুবই অন্তরঙ্গ, তাদের কাছ থেকে সরে যাওয়াই ভাল। একটা বাতি তুলে নিয়ে গারল্যান্ড ল্যারিকে নিয়ে গেল হলঘরে।

'বাহ্!' তার স্বরে ঝরে পড়ল প্রশংসা। 'প্যাঁচানো সিঁড়ি। যেন ঐতিহাসিক কোন ছায়াছবির জিনিস।'

'তাই, না?'

প্যাঁচানো সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে উঠে গেছে উপরের অন্ধকারে। পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে চলল গারল্যান্ড, খুশি মনেই যেন সে চলল পেছন পেছন। তাকে উপরতলার হলঘরে নিয়ে গিয়ে হাতের বাতি উঁচু করে ধরল গারল্যান্ড। বাতির আলোয় দেখা গেল, কার্পেটের উপর পড়ে আছে জীর্ণ গোলাপ।

'এই যে,' বলল সে, 'এটাই আমার বেডরুম।'

ঠেলে খুলে দিল সে ভারী দরজাটা। তারপর দু'জনেই ভিতরে ঢুকল একত্রে। জানালার পাশের একটা টেবিলের উপর রাখল সে বাতিটা।

'সত্যি, গারল্যান্ড,' বলল ল্যারি বিড়বিড় করে, 'এই বাড়ির কোনও তুলনা হয় না। এরকম বাড়ি আমি কখনোই দেখিনি আগে। এই বিশাল পালঙ্ক, কারুকাজ করা টেবিল–সত্যিই অপূর্ব! ওল্ড ইজ গোল্ড। এগুলো খাঁটি পুরনো জিনিস।'

'আমার চেয়েও পুরনো,' হাসল গারল্যান্ড।

'তুমি তো পুরনো নও, গারল্যান্ড। তুমি সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর।'

এবার গারল্যান্ড হেসে উঠল খিলখিল করে। 'তুমিও খুব সুন্দর।'

বসল তারা বিছানার উপর। বিছানায় পাতা গাঢ় নীল ভেলভেটের চাদর, তাতে সোনালি সুতোর কারুকাজ। ল্যারি এখন প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ।

'এগুলো যে কত সুন্দর তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না,' তোতলাতে লাগল সে।

'তা হলে আর বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। বিছানায় পা তুলে বসো। এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। এবার আরাম করো।'

শুয়ে পড়ল সে। তার শার্টের বোতাম খুলে দিল গারল্যান্ড। 'কী সুন্দর তোমার ঘাড়!'

'না, না, আমার ঘাড় খুবই সাধারণ। ঘাড় সুন্দর হলো গাইয়ের। ব্যায়াম আর ভারোত্তোলনের ফল।'

'গাইয়ের কথা বাদ দাও, ও এখন ক্লডিয়ার সঙ্গে আছে। ওরা ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। এসো, আমরা বলি আমাদের কথা।'

দরজার বাইরে শব্দ হলো খসখস করে। গারল্যান্ড সেদিকে কান দিল না। ল্যারি এখন সম্পূর্ণ নীরব, চোখজোড়া বোজা তার। ঝুঁকে পড়ল গারল্যান্ড, পেলব আঙুলে ম্যাসেজ করতে লাগল ল্যারির কপাল আর ঘাড়। নিশ্বাস এখন ছন্দময় তার, যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। গারল্যান্ড আরও ঝুঁকে পড়ল তার উপর, ধীরে ধীরে ঘাড়ে বোলাতে লাগল হাত। তারপর একসময় বেঁকে গেল তার আঙুলের ডগা, বসে যেতে লাগল ঘাড়ের নরম চামড়ায়।

বাতির আলোয় গারল্যান্ডের ঠোঁট এখন রক্তের মত লাল। কয়েক মুহূর্ত পর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল দাঁত। স্ফটিকের মত ঝকঝকে, লম্বা, তীক্ষ্ণ। গুনগুন করে সে গান গাইল কিছুক্ষণ। তারপর গান বন্ধ করে ঝুঁকে পড়ল আরও। আবার তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল ঘাড়ের কাছে এসে।

দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল ফিসফাস। ক্ষীণ সেসব স্বর কেমন যেন অমানুষিক।

পালঙ্ক থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগোল গারল্যান্ড। সামান্য খুলল সে দরজাটা।

শীর্ণ অনেকগুলো শরীর দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, পরনে তাদের ন্যাকড়ার মত পোশাক। 'এই শয়তানেরা,' গারল্যান্ডের ফিসফিসানিতেও ফুটে বেরুল হিংস্রতা, 'তোরা অপেক্ষা করতে জানিস না?'

'আমাকে ভেতরে যেতে দাও,' বলল তাদের একজন। ফ্যাকাসে মুখে চোখজোড়া তার আগুনের মত গনগনে। 'আমাকে ভেতরে যেতে দাও,' বলল আরেকজন। 'খিদে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—'

'একটু অপেক্ষাও কি সয় না তোদের?' আবার ধমকে উঠল গারল্যান্ড। 'আমি শেষ করলেই তো তোরা পেয়ে যাবি ওকে। অবশিষ্ট যা থাকবে ওর, সবটুকু তো তোদেরই।'

তারা গাঁইগুঁই করা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ করে দিল গারল্যান্ড, চোখের পলকে ফিরে এল পালঙ্কের উপর। চোখ বুজে তখনও ছন্দময় নিশ্বাস ফেলছে ল্যারি, একটা সোনালি শরীরকে জড়িয়ে ধরে সোনালি একটা রাত কাটাবার স্বপ্নে বিভোর।

মূল : ফ্রান্সেস গারফিল্ড

রূপান্তর : খসরু চৌধুরী

বিনোদপুরের ঘোড়া

সকাল থেকে মুখ ভার করে আছে আকাশ। ভরা ভাদ্রের আকাশ। ভ্যাপসা গরম পড়েছে। তা-ও আবার রাজশাহীর। ভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে হলে ফেরার পর থেকে কেন জানি কোন কিছুতে মন বসছিল না তুহিনের। গোসল সেরে ডাইনিং রূমে খাওয়াদাওয়া করে আড্ডা মারার জন্যে গেল ফজলারের রূমে। ফজলার থাকে ইস্ট হাউসের ৯ নম্বর রূমে। যেয়ে দেখে তাস খেলায় মশগুল ওরা। রুহুল, পাবনার নান্নু, ফিরোজ, শান্ত, মজদুল ভাই, জলিল ভাই, মোজাফফর ভাই। তাসে ইদানীং আর মন বসাতে পারে না তুহিন। রুহুলের অফার করা একটা স্টার সিগারেট টেনে ঘুমানোর জন্যে ফিরল ওয়েস্ট হাউসে, নিজের ১১ নম্বর রূমে। রুহুল হচ্ছে এমন বন্ধু যাকে ও ডাকে অলওয়েজ রেডি বলে। অর্থাৎ, সবসময়ে সব কাজের জন্যে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত। এমন বন্ধু ভার্সিটিতে পাওয়া ভার।

কিন্তু কোথায় ঘুম! বিছানায় বিফল সময় গড়াল ঘণ্টাখানেকের মত। শেষে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে মাকে একটা বিশাল চিঠি লিখে ফেলল। তারপর জামাকাপড় পরে শেরে বাংলা হল থেকে বেরিয়ে বিনোদপুরে গেল হবি ভাইয়ের দোকানে। পান সিগারেটের দোকান হবি ভাইয়ের। বয়স হয়ে গেছে। বেশ রসিক মানুষ। মজার মজার গল্প বলতে পারে। কেন জানি খুব পছন্দ করে তুহিনকে। ও দোকানে গেলেই যত্ন করে নানা মসলা দিয়ে বানিয়ে দেয় পান, তারপর বাড়িয়ে ধরে সিগারেটের শলা। দোকানের সামনে বসানো উঁচু টুলটায় বসে পান চিবুতে চিবুতে আর সিগারেটে দম দিতে দিতে হবি ভাইয়ের যত সব আধিভৌতিক গল্প শুনে ভার্সিটি জীবনের অনেক বিমর্ষ সময় কাটিয়েছে ও।

কপালটাই খারাপ ওর। হবি ভাই তখনও তার দুপুরের সুখ নিদ্রা ছেড়ে দোকানে ফেরেনি। ভাগ্নে সামলাচ্ছে দোকান। হবি ভাইয়ের ছেলেপুলে নেই। ভাগ্নেকে পালক নিয়েছে। ওকে আসতে দেখে একটা সালাম ঠুকে স্পেশাল পান বানিয়ে আর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নিজের বিক্রি বাট্টায় মন দিল ভাগ্নে।

হবি ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করার সময়টা অস্থির লাগছে তুহিনের। মনের মেঘ কেবল কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। এদিকে ভাদরের ঘাম ঝরতে শুরু করেছে শরীরে। কী করব কোথায় যাব করতে করতে সিদ্ধান্ত নিল শহরে যাবে রায়হানের কাছে। ওকে নিয়ে ন্যু মার্কেটে কিছুক্ষণ টাংকি মেরে ঝরঝরে হয়ে ফিরবে।

বিনোদপুর থেকে রিকশা নিয়ে শহরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল ও।

বিনোদপুর থেকে শহর আর শহর থেকে বিনোদপুর, এ পথের রিকশা ভ্রমণ কত যে প্রিয় ওর। আহ! এর জন্যে গাঁটের অনেক পয়সা খরচ করেছে ও। কখনও মনে হয় অহেতুক। কী এমন দৃশ্য আছে এই পথে? কিন্তু তবু কেন যেন একটা নেশার মত লাগে। বিশেষ করে রাতে, ফেরার সময়। চাঁদনী রাত হলে তো কথাই নেই। দক্ষিণে পদ্মার বাঁধ। উঁচু টিলার মত। দেখা যায় না ওপাশের শুকিয়ে যাওয়া গাঙ। ধু ধু বালুচর। কিন্তু উঠে আসে বাতাস। শীতল হাওয়া। উদাস করে দেয় মন। মনে পড়ে ছেড়ে আসা বাড়ি, মায়ের মুখ, ভাইবোন, ছোটবেলার খেলার সঙ্গীদের। প্রকৌশল কলেজ পার হলে তালাইমারি। আবছা হয়ে দেখা দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ, মতিহারের সবুজ চত্বর। হাতছানি দেয় বিনোদপুর, শেরে বাংলা হল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় সবচেয়ে ভাল লেগেছিল শেরে বাংলা হলকে। একে তো ক্যাম্পাসের সবচেয়ে কাছে, তার ওপর দক্ষিণ খোলা। একটানা লম্বা অফুরন্ত বারান্দার মত, অন্য হলগুলোর মত সীমিত বর্গক্ষেত্র নয়। সামনে বাগান, ঘাস ভরা মাঠ, আর কত গাছাগাছালি। জেদ চেপেছিল এই হলে ভর্তি হবার। হয়েছে; তবে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। অবশ্য ওর ভাল রেজাল্টই ওকে সাহায্য করেছে বেশি।

না। রায়হানের বাসায় যেয়ে ওর মা-র মুখে শুনল তাঁর ছেলে ভার্সিটি থেকে ফিরে পড়িমরি করে গোগ্রাসে ভাত গিলেই বেরিয়ে গেছে। গন্তব্য বলে যায়নি। নাহ্, দিনটায় কুফা লেগেছে। রায়হান কোথায় গেছে সেটা আন্দাজ করতে বেগ পেতে হচ্ছে না ওর। পুকুর পাড়ের তাড়ির আড্ডায়। ক্লাসেই তেমন ইঙ্গিত দিয়েছিল ও। আজ নাকি নতুন তালের রস আসবে। রাজশাহীর মানুষের এই এক বাতিক! তাড়ির গন্ধ পেলেই দিনদুনিয়া ভুলে যায়।

কিন্তু আজ কোন নেশায় ডোবার মন নেই তুহিনের। আজ ও চাচ্ছে একটা জম্পেশ আড্ডা। কোন কাজ সমাধা করার জন্যে তৃতীয়বারই হচ্ছে নাকি শেষ সুযোগ। তাই আর কোন বন্ধুর সঙ্গ পাবার আশা ত্যাগ করে একা একাই সরাসরি ন্যু মার্কেটে চলে এল। একা একা ও আবার টাংকি মারতে পারে না। তখন একেবারে নিরীহ গোবেচারা।

ন্যু মার্কেটে ভাগ্য ফেভার করল ওকে। তাজ টেইলার্সে যেয়ে দেখা পেল ছোট তাজের। দুই ভাই চালায় দোকান। দোকান চালু করার শুরু থেকেই তুহিন ওর শার্ট প্যান্ট কাটায় ওদের কাছে। তখন ও পড়ত রাজশাহী কলেজে।

ছোট তাজের মুখে হাসি লেগেই থাকে। এ এক অমূল্য সম্পদ মানুষটির। আর সিগারেট অফার করায় দিলদরিয়া। সে কারণে অনেক সময় ওদের অনেক বাজে কাটিংকেও ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে হয় ওকে।

অন্যদিনের মত আজও হাসি উপহার দিল ছোট তাজ এবং সেই সাথে সিগারেট। অভিযোগ করল, কাপড়চোপড়ের প্রতি আর আগের মত ঝোঁক নেই তুহিনের। কথাটা সত্যি, কলেজে পড়ার সময় সে ছিল ফ্যাশন দুরস্ত। দু'এক মাস অন্তর অন্তর বানাত শার্ট অথবা প্যান্ট। এখন ছয়মাসেও বানায় কিনা

সন্দেহ। স্বাধীনতার পর থেকেই স্পৃহাটা মরে গেছে। অবশ্য এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেদনার স্মৃতি। স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন শুরু হবার পর বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণের দিনই এক বস্ত্রে হল ত্যাগ করে ও। রুমে, স্টীলের আলমারিতে সাজানো ছিল দেড় ডজন প্যান্ট, দুই ডজন শার্ট, এক ডজন নাইলনের গেঞ্জি, হাফ ডজন পুলওভার, এবং আট জোড়া জুতো। যুদ্ধকালীন সময়ে লুট হয় বিশ্ববিদ্যালয়, হল। স্বাধীনতার পর কিছুই পায়নি ও। সেই সাথে কত উপন্যাস, গল্প আর কবিতার বই।

বড় তাজের সঙ্গে এক ভদ্রলোক গল্প করছিলেন। গল্প করতে করতে ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, সূর্য দীঘল বাড়ি ছবিটি একেবারে বাজে হয়েছে। শুনেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল তুহিনের। সূর্য দীঘল বাড়ি উপন্যাসটি ওর শুধু প্রিয় উপন্যাসই নয়; ওর মতে, পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেরও একটি। মন্তব্য শুনেই ছবিটি তখনই দেখার জেদ চাপল ওর। ভালই হলো, এর চেয়ে সময় কাটানোর শ্রেষ্ঠ বিকল্প আজ অন্তত ওর হাতের নাগালে নেই। ছবিটি চলছেও ন্যু মার্কেটের পাশে, স্নিগ্ধা হলে। সপ্তাহখানেক হলো ছবিটি রাজশাহীতে এসেছে। দেখব দেখব করতে করতে কেমন করে যেন ভুলে বসে আছে। মনে পড়ছে, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মনোজ বসু উপন্যাসটি নিয়ে কত গর্বই না করেছিলেন।

ছবিটি দেখার উদ্দেশে তাজ ভাইদের কাছে বিদায় নিয়ে ন্যু মার্কেটের উত্তর পশ্চিমের গেট দিয়ে বেরুবার মুখে রেস্তোরাঁর সামনে ওর পথ আগলে দাঁড়াল চিচড়া। ভীষণ রুগ্ন বলে ওকে সবাই ডাকে চিচড়া। আসল নাম শহীদ। কলেজ জীবনে পরিচয়। কলেজের গণ্ডি সে এখনও কাটাতে পারেনি। আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে তো থাকেই, তার ওপর বানাতে পারে যতসব অশ্লীল গল্প। কলেজের মেয়েদের সে যে কত স্থূল নাম দিয়েছিল তা গুনে শেষ করা যাবে না। ওর গল্প শুরু হলে থামতে চায় না, শুধু ছড়াতে থাকে ডালপালা, তারপর একসময় মূল গল্প যায় হারিয়ে।

তুহিনকে পাকড়াও করল চিচড়া। 'দোস্ত, দাঁড়াও।'

'না, দোস্ত। মাফ করো। সিনেমা দেখব।'

'কোথায়?'

'স্নিগ্ধায়।'

'মানে সূর্য দীঘল হাঁড়ি!'

রাগ করতে পারল না তুহিন। বরং হাসি এল। এদের মত ব্যর্থ মানুষগুলোকে কেন যে ওর এত ভাল লাগে! মনে হয় কত আপন! কোথা থেকে যে ওদের জন্যে এত মমতা আসে! ওদেরকে সময় দিতে গিয়ে জীবনে অনেক মাসুল দিতে হয়েছে ওকে। বিশেষ করে পরীক্ষার রেজাল্টে। টাকাপয়সা তো আছেই। কিন্তু তবু পারে না ওদেরকে পাশ কাটাতে।

'হ্যাঁ, দোস্ত। হাঁড়ি! যাই, একটু টাইম কিল করি,' হাসতে হাসতে বলল

তুহিন।

'যাও, যাও। তোমরা তো আবার আঁতেল। মরো গে। আমাকে একটা কাঠি দিয়ে যাও। তা ছবি তো পাবে না।'

কাঠি মানে সিগারেট। একটা সিগারেট বের করে অবাক হয়ে তুহিন জানতে চাইল, 'কেন, দোস্ত? ছবি পাব না কেন?'

'আফিম কি আমি খেয়েছি না তুমি খেয়েছ! ইভিনিং শো-র টাইম তো মেলা আগে পার হয়ে গেছে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তুহিন দেখল, সত্যিই তাই। ছ'টা বেজে পনেরো। ছবি শুরু হয়ে গেছে সন্ধে ছ'টায়। এবার ও অনুভব করছে, আজ মনের গভীরে কোথায় যেন কীসের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তাই মন কোথাও বসছে না। মনোযোগের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে।

একবার ভাবল, ছবি না দেখেই হলে ফিরে যাবে। পরে চিন্তা করল না, আজকে মিস করলে আর কখনোই দেখা হবে না। তাই নাইট শো দেখার সিদ্ধান্ত নিল তুহিন। এখন বাকি সময়টা চিচড়ার সঙ্গে আড্ডায় কাটানো ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই।

ছবি শুরু হবে রাত সাড়ে আটটায়। দুটো ঘণ্টা রেস্তোরাঁয় বসে কাটল চিচড়ার সব অশ্লীল-গল্প শুনে। ধ্বংস হলো চার কাপ চা। এক প্যাকেট চানাচুর। চিচড়া আবার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, টাকাপয়সা বেশি ধসায় না। তুহিনের কাছ থেকে নতুন নতুন সিগারেটের বায়না না ধরে ওর খাওয়া সিগারেটের মোথা টানল।

দুই

ছবি শেষ হলো রাত দশটা পঞ্চাশে। আসলে উপন্যাসের পাঠকের দৃষ্টিতেই ছবিটি দেখেছে তুহিন। অপূর্ব! কিন্তু বিষাদে ছেয়ে গেছে মন। পড়ার সময় যাদের সংগ্রামের দৃশ্য কল্পনায় সাজাতে চেয়েছে তারাই আজ জীবন্ত হয়ে দেখা দিল সেলুলয়েডের ফিতায়।

কিন্তু বাইরে তখন ছবির চেয়েও বেশি মন খারাপ করা দৃশ্য। আকাশে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। যে কোন মুহূর্তে শুরু হবে বৃষ্টি। বৃষ্টি যদিও ওর প্রিয়, তবে বৃষ্টিকে ও উপভোগ করতে চায় ঘরে বসে আয়েশ করে। বিশেষ করে হলে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে মারতে। অথবা কবিতা পড়তে পড়তে। কিন্তু বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রিকশায় যাওয়া একেবারে অসহ্য লাগে। তা-ও আবার এত দূর রাস্তা!

রিকশাঅলারা বিনোদপুর যেতে চাচ্ছে না। যারা নিমরাজি তারা দাম

হাঁকাচ্ছে অনেক। এদিকে বাড়ছে বিদ্যুতের চমকানি, মেঘের গর্জন। পুঞ্জীভূত টেনশনে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এক রিকশাঅলা রাজি হলো। ভাড়াও যুক্তিসঙ্গত। লোকটার চেহারা করুণার উদ্রেক করে। মুখটা শুকনো, লম্বা। শরীরে রক্ত নেই, রঙ কেমন ফ্যাকাসে। যেন কতদিন না খেয়ে আছে। গলার স্বর খসখসে, চাপা। কথা বলতে হাঁপাচ্ছে। এক কথা থেকে আরেক কথায় যেতে দম নিচ্ছে, কাশছে।

শহর পেরিয়ে কল্পনা সিনেমা হল অতিক্রম করতে না করতেই আরম্ভ হলো অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি। তবে হাওয়া নেই। নেই ঝাপটা। এই যা রক্ষে। রিকশাঅলার কাছ থেকে পর্দা নিয়ে রিকশার হুডের দুই পাশ আর নিজেকে ঢাকল তুহিন।

রিকশাঅলাটা রুগ্ন হলে কী হবে, চালাচ্ছে ভাল। জোরেও নয়। আস্তেও নয়। মসৃণ। যেতে এখন আরামই পাচ্ছে তুহিন।

চলছে রিকশা। চরাচর ডুবে আছে অন্ধকারে। এমনিতেই অনেক রাত তার ওপর বৃষ্টি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না চারপাশের। অবশ্য ও দেখার চেষ্টাও করছে না। ডুবে আছে মনের গভীরে। স্মৃতির পাতাল থেকে উঠে আসছে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কাণ্ডকীর্তিগুলো। কাগজের নৌকা বানিয়ে পুকুরে ছেড়ে দেয়া, কালভার্টের ওপর থেকে নালায় ঝাঁপিয়ে পড়া, একবার তো মরেই যাচ্ছিল, বর্ষায় পানি ছিল অনেক গভীর, আর নালার তলদেশ ভরে ছিল কাদায়, তখন ভালমত সাঁতারও জানত না ও, ঝাঁপ দিতেই ডুবে গেল পানিতে, পা আটকে গেল কাদায়, ভাগ্যিস একটু দূরে এক কৃষক পাট ধুচ্ছিল, দৃশ্যটা চোখে পড়তে সে এসে উদ্ধার করে ওকে; কিন্তু যে কাণ্ডের কথা মনে পড়লে ওর এখনও হাসি পায় তা হচ্ছে বৃষ্টি নামলেই ও কাপড়চোপড় খুলে একেবারে দিগম্বর হয়ে দাঁড়াত বারান্দার কোণায়, টিনের চালের কার্নিশ বেয়ে ভীষণ বেগে পড়ত বৃষ্টির স্রোত, বেগের তোড়ে মাথা ছিঁড়ে যেতে চাইত, কিন্তু একচুলও নড়ত না ও। আশ্চর্য! তখন এতটুকু ভয় করত না বৃষ্টিতে ভেজার, অসুখের চিন্তা তো মাথাতেই ঢুকত না, অথচ কতবার মরার মত ভুগেছে জ্বরে।

বৃষ্টি বেড়ে গেছে। শৈশবের স্মৃতিচারণ বিচ্ছিন্ন হলো সিগারেটের নেশা চাপায়। পকেট হাতড়িয়ে তুহিন দেখে একটা মাত্র সিগারেট পড়ে আছে প্যাকেটে। কিন্তু দেশলাই নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেল না। হতাশায় ভরে গেল মন। ভাবল, রিকশাঅলার কাছে দেশলাই থাকতে পারে। চাওয়ার জন্যে মাথা তুলল তুহিন। রিকশার হুডে পেঁচানো পর্দা ওর নাক বরাবর ঢাকা। এক হাতে ও টেনে ধরে রেখেছে পর্দাটাকে। জুতো দিয়ে চেপে রেখেছে পর্দার নীচের দু'প্রান্ত। অন্য হাত তখনও খুঁজছে দেশলাই পকেটে পকেটে। দেশলাই না থাকাটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

নাক বরাবর পর্দার ওপর দিয়ে অন্ধকারে বৃষ্টির ভেতরে চোখ চালিয়ে তুহিনের মনে হলো রিকশা মতিহার ছেড়ে যাচ্ছে। যাক্। এসে গেছে তা হলে।

তৃপ্ত মনে নিসর্গ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেশলাই চাইবার জন্য রিকশাঅলাকে ডাকতে গেল ও। আর তখনি যে দৃশ্য ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে তাতে বিস্ময়ে অবিশ্বাসে প্রথমে অবাক আর বিভ্রান্ত হলেও শরীর শিরশির করতে করতে ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। ঠোঁট বন্ধ হয়ে গেছে। গোটা শরীর স্থির হয়ে আছে। আর চোখ যেন পাথর, দেখছে রিকশাঅলার দেহ।

কোথায় রিকশাঅলা! নেই। মানুষ নয়! রিকশা চালাচ্ছে একটা ঘোড়া। ইতোমধ্যে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণরূপে থেমে গেছে তুহিনের শরীরে। বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে দেহ। বন্ধ করতে চাচ্ছে চোখ, হচ্ছে না; মার্বেলের মত শক্ত। কাজ করছে না মন। হারিয়ে গেছে মনের শক্তিও।

ঘোড়া! একটা সত্যিকারের ঘোড়া টানছে রিকশা। গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। মার্বেলের মত গোল স্থির চোখকে কোনমতে বাঁকা করে তুহিন দেখতে চাইল রিকশার হাতল ধরা হাত দুটোকে। নির্ভুল! কোন আঙুল নয়। দু'দিকের দুই হাতল ধরে আছে দুটো ঘোড়ার খুর। আতঙ্ক, কিন্তু তার সাথে কৌতূহলও গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে তুহিনকে। শক্ত চোখের দৃষ্টি নেমে গেল রিকশার প্যাডেল দুটোতে। স্পষ্টভাবে আবার দুটো খুর দেখল সেখানে। ঘোরাচ্ছে প্যাডেল।

চোখ বন্ধ করে ফেলতে চাইল তুহিন। পারল না; বরং স্থির হলো ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর। বৃষ্টিতে জবজবে হয়ে আছে কেশর। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি খয়েরি রঙের লোম বেয়ে। লেজটা ঠেকে আছে পর্দায় ওর বুক বরাবর। মাঝে মাঝেই মাথা থেকে ঝাড়ছে বৃষ্টির পানি। নাড়াচ্ছে কান। পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। নাক আর চোখ দেখতে পাচ্ছে না ও। কিন্তু মুখ নড়ছে। চাটছে ঠোঁট। হয়তো চিবুচ্ছে মেরে ফেলা রিকশাঅলার মাংস, চাটছে তার রক্ত। কিংবা কে জানে রিকশাঅলাটা নিজেই এই ঘোড়া কিনা! মুখটা তো তার লম্বা ছিল ঘোড়ার মতই!

আর কোন সন্দেহ নেই। ঘোড়ার পাল্লায় পড়েছে তুহিন। রাজশাহীর ঘোড়া। ঘোড়া নিয়ে কত ভৌতিক গল্পই না শুনিয়েছে বিনোদপুরের হবি ভাই। একে একে মনে পড়ছে সে কেচ্ছাগুলো। লোমহর্ষক! কিন্তু শোনার সময় মজাই পেয়েছে ও। এমনিতে ও রহস্যগল্প বিশেষ করে ভূতের গল্পের পোকা। বৃষ্টির রাতে মাঝে মাঝেই নিজের রুমে আসর বসায় ভূতের গল্প শোনার আর বলার। সে আসরে উৎসাহী শ্রোতা আর বক্তাও নেহাৎ কম নয়। আসে হান্নু, গিয়াস, হুদা, খোকন, তারু, খুলনার নান্নু, লিয়াকত, নবাবগঞ্জের বাবুল, তাজ, আরও কেউ কেউ। সেসব আসরে কাল্পনিক ভয় আর আতঙ্কে শিউরে ওঠার এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করেছে ও।

কিন্তু আজ, এখন আর কল্পনা নয়। চোখের সামনে জলজ্যান্ত এক ঘোড়া। টানছে ওরই রিকশা। হবি ভাই বিশ্বাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক প্রেত আছে। অই দানোগুলো জন্ম নিয়েছে নিঃস্ব মানুষের অতৃপ্ত আত্মা থেকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। বিপুল জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল এই ক্যাম্পাস বানাতে। অই জমির মালিকদের অনেককেই ঠিকমত ন্যায্য দাম দেয়া সম্ভব হয়নি। আবার কেউ কেউ ধরতে গেলে কিছুই পায়নি। ওদের অনেকেই নাকি পরে পাগল হয়ে প্রলাপ বকতে বকতে মারা গেছে।

অইসব অতৃপ্ত আত্মার বেশিরভাগই এখন রহস্যালোকের বাসিন্দা। ঘুরে বেড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, কাজলায়, বিনোদপুরে। বিনোদপুরের ভূতগুলো নাকি ঘোড়ার রূপ নিতেই পছন্দ করে বেশি। হবি ভাই একটা সত্যিকারের ঘটনার কথা বলেছিল। শেরে বাংলা হল, সে সময় এর নাম ছিল জিন্নাহ হল, নির্মাণের প্রথম দিনগুলোতে এক রাতে হলের গেটের সামনে আম গাছের নীচে এক ছাত্রের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। এবং তার বুকে নাকি ছিল ঘোড়ার খুরের দাগ: সে ক্ষত থেকে ঝরছিল রক্ত।

শিউরে উঠল তুহিন। গল্প নয়। আজ ওকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে বিনোদপুরের ঘোড়ার সামনে। ভূত নয়! প্রেত নয়! দানো নয়! জলজ্যান্ত ঘোড়ার। কী করবে ওকে, অসহায়ের মত নিজেকে প্রশ্ন করল ও। মেরে ফেলবে? কীভাবে? নিশ্চিত মৃত্যুর ঘোষণা শোনার পর রোগীরা যে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ায়, সেই নিঃসঙ্গতা নিয়ে চোখ বন্ধ করতে গেল ও। আর তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠল শেরে বাংলা হলের গেটের দৃশ্য। অই তো! বেশি দূর মনে হচ্ছে না। তবে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট পথ।

গেটের ওপাশে, ভেতরে, গুঁমটি ঘরে বসে হল পাহারা দিচ্ছে করিম। যেসব রাতে ঘুম আসে না, সেসব রাতে করিমের কাছে গল্প করতে আসে তুহিন। করিমের পেটেও আছে অনেক কেচ্ছা। তার ওপর দম দেয় গাঁজায়। লাল টকটকে হয়ে থাকে চোখ। সেই জবা রঙের চোখ নিয়ে কত দম ফাটানো গল্পই না শুনিয়েছে ওকে। নিদ্রাহীন রাতে যেমন, আজকেও তেমনি এই মুহূর্তে করিমকেই শেষে আশ্রয় মনে হচ্ছে ওর। নিশ্চয় জেগে আছে করিম। বৃষ্টি পেয়ে হয়তো ফুর্তিতে দম দিচ্ছে কলকিতে। নিজেকে ভরসা যোগাল তুহিন। তবে ভূতে-টুতে বিশ্বাস করে না করিম। হবি ভাইয়ের গল্পের কথা তুললে হাসতে হাসতে গাঁজার কলকি ফাটিয়ে ফেলার উপক্রম করে সে। বলে, 'আমার জমিও তো খেয়েছে ভার্সিটি, তাই বলে কি আমিও ভূত হব নাকি! আসলে হবি হচ্ছে চোয়ানিখোর। দেশি মদের নেশায় উল্টোপাল্টা দেখে সে।'

অনেক হিসেব করে নিজের চেতনায় বাঁচার পথ বের করল তুহিন। রিকশায় করে গেট পর্যন্ত পৌঁছানোর অপেক্ষা করা যাবে না, এখান থেকেই লাফ মেরে নেমে দৌড়ে পৌঁছাতে হবে গেটে: গেট বন্ধ থাকবে, এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায়, তাই করিম করিম বলে চিৎকার করতে করতে শিক ধরে গেটের মাথায় উঠে মারতে হবে লাফ: তারপর যা থাকে কপালে। নিজেকে আশ্বাস দিল ও, নিশ্চয় ওর চিৎকার শুধু করিম নয়, পৌঁছাবে ইস্ট হাউস পর্যন্ত। ওখানে আছে ওর কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নিশ্চয় ওদের কারও না কারও কানে পৌঁছাবে ওর চিৎকার। কেননা

ওদের অনেকেই নিশাচর। তা ছাড়া সিরাজ থাকে দোতলায়। ওখানে চিৎকার তাড়াতাড়ি পৌঁছুবে। একজন না একজন অবশ্যই ছুটে আসবে ওর আর্তনাদ শুনে।

হ্যাঁ! গেট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরপর তিনটা আম গাছ পেরুলেই পাঁচ ছয় গজ হবে পথ। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার দুর্মর আকুতি নিয়ে পর্দাটা ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়ে মেরে চলন্ত রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নামল তুহিন। শরীরের সমস্ত ক্ষিপ্রতা নিয়ে ছুটল সামনের দিকে। ইতোমধ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে আর্তনাদ: করিম…করিম… বাঁচাও…করিম…!

গেটে প্রায় পৌঁছে গেছে তুহিন। এমন সময় শোনে পেছন থেকে ওকে ডাকছে: 'স্যার, ভাড়াটা দিলেন না, স্যার। গরীব মানুষ, স্যার। কয়েকদিন থেকে না খেয়ে আছি, স্যার। ভাড়াটা দেন, স্যার…'। মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হলো ও। মনে হচ্ছে ঘোড়া নয়, মানুষের কণ্ঠ; স্নিগ্ধা সিনেমা হলের সামনে ভাড়া ঠিক করার সময় রিকশাঅলার যেমন গলা শুনেছে হুবহু সেই গলা। একবার কৌতূহল হলো, পেছনে ফিরে দেখে রহস্যটা কী। কিন্তু না, মনে পড়ছে হবি ভাইয়ের উপদেশ, 'ভাইয়া, ভূতে ডাকলে কখনও পিছন ফিরে তাকাবেন না। বাঁচার ইচ্ছে থাকলে ভুলেও ঘাড় ফেরাবেন না। অই সময়টাতেই ওরা ধরে।'

মনের বিভ্রম কাটিয়ে এক ছুটে গেটে পৌঁছল তুহিন। মুখ দিয়ে ক্রমাগত বের হচ্ছে চিৎকার: করিম…বাঁচাও…। বেড়ালের মত ক্ষিপ্র গতিতে শিক বেয়ে গেটের মাথায় পৌঁছল ও। শুনতে পাচ্ছে, তখনও পেছন থেকে ডাকছে, 'স্যার…ভাড়াটা…গরীব মানুষ…।' মানুষের গলা। নির্ভুল। কিন্তু না। পেছনে তাকানো যাবে না। 'করিম' বলে মারল লাফ, নীচে। যাক! বাঁচা গেছে! সৃষ্টিকর্তা মৃত্যুর গুহা থেকে ফিরিয়ে এনেছে ওকে। শুকরিয়া আদায় করল ও। বুক থেকে নেমে গেল পাথর। চেপে রাখা দমটা বেরিয়ে যেতেই স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাস। আর ভয় নেই। নিজ রাজ্যে প্রবেশ করেছে ও।

গুমটি ঘরের দিকে নিশ্চিত পায়ে এগোতে এগোতে তুহিন দেখতে পেল, ওর আর্তনাদ শুনে ব্যস্ত হয়ে গুমটির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে করিম। বৃষ্টির জন্য বাইরে নামতে পারছে না বেচারা। কিন্তু অস্থির হয়ে আছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

গুমটির দরজায় পৌঁছে অস্ফুট স্বরে তুহিন বলল, 'করিম…একটা…!'

'কী হয়েছে, স্যার?' উতলা হয়ে করিম জানতে চাইল। 'হাঁফাচ্ছেন কেন? এত পেরেশান লাগছে কেন আপনাকে। বসুন। বসুন। আরাম করে টুলটাতে বসুন।'

'ঘর অন্ধকার কেন, করিম? বাতি জ্বালাও। একটা ঘোড়া…।'

'ঘোড়া! কোথায়?'

'অই তো গেটের বাইরে। আমার রিকশা টেনে এনেছে।'

'কী বললেন!' হাসতে আরম্ভ করল করিম। ওর সেই বিখ্যাত দম ফাটানো হাসি। বৃষ্টির সুযোগে নিশ্চয় মনের সুখে কলকিতে দম দিয়ে গেছে। লাল টকটকে চোখে নাচছে কৌতুক। ভূতে সে বিশ্বাস করে না। 'ঘোড়া! হা হা···।'

'হাসি থামাও করিম,' উত্তেজনায় ধমকে উঠল তুহিন। 'চোখ দুটো দিয়ে ভাল করে তাকাও গেটের বাইরে।'

'কী যে বলেন, স্যার! ও তো রিকশাঅলা। ভাড়ার জন্য কাঁদছে। তুহিন ভাই, ভাড়াটা বের করেন, আমি দিয়ে আসি। আপনার কষ্ট করে যেতে হবে না।'

'না, না, করিম। কসম খেয়ে বলছি, বিশ্বাস করো, ওটা মানুষ নয়, ভূত। তুমি যেয়ো না।'

'কেমন ভূত?'

'ঘোড়ার মত।'

'কেমন ঘোড়া?'

'বন্ধ করো তোমার কৌতুক। ঘোড়া যেমন হয় ঠিক তেমনি।'

'আমার মত!' হাসতে হাসতে করিম মেলে ধরল ওর দুটো হাতের তালু।

পাথর হয়ে গেছে তুহিন। ভয়ে। হারিয়ে যাচ্ছে চেতনা। করিমের বাড়িয়ে ধরা তালু দুটো মানুষের নয়, ঘোড়ার খুর। যেমন দেখেছে রিকশায়।

হাসছে করিম। অট্টহাসি। কিন্তু মানুষের হাসি নয়। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি।

চোখের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে মানুষ নয়! করিম নয়! ঘোড়া! অবিকল রিকশা টানা ঘোড়াটার মত!

গেটের বাইরে থেকে কেউ আর ডাকছে না ওকে। কোন ডাক শুনতে পাচ্ছে না তুহিন। চেতনা হারিয়ে গুমটি ঘরের দরজায় ঢলে পড়ল ও।

তিন

বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পর রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চেতনা ফিরল তুহিনের। চোখ মেলতেই চোখাচোখি হলো মেডিক্যালে পড়া বন্ধু দুলালের সঙ্গে। এরপর একে একে এল ওর ভার্সিটির বন্ধুরা। সবাই জানতে চাইছে, কী হয়েছিল ওর? কেন অত রাতে গিয়েছিল গুমটি ঘরে? জ্ঞান হারানোর কারণ কী?

ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনাল তুহিন। সবাই বিস্ময়ে আতঙ্কে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ওরে বাপ! আবার বিনোদপুরের ঘোড়া! আল্লাহ তোকে বড় বাঁচা বাচিয়েছে রে।'

কিন্তু বেঁচে থাকার সৌভাগ্য কিংবা মরণের ভয় নয়, তুহিনের বিস্ময় এখন করিমকে নিয়ে। ও নিশ্চিত, করিম বলে কেউ নেই, কখনও ছিল না। করিমই

হচ্ছে সত্যিকারের ভূত। এবং সেজন্যেই সে ভূতে বিশ্বাস করত না।

তুহিন ওর শেরে বাংলা হলের বন্ধুদের কাছে জানতে চাইল, করিমকে ওরা গত দু'দিনে দেখেছে কি না। কেউ-ই ওর কৌতূহল মেটাতে পারল না। কেউ বলল, দেখেনি। কেউ শোনাল, খেয়াল করেনি। কিন্তু দেখেছে, এমন কথা কেউ বলল না। করিম একটা ভূত, শুধু ভূতই নয়, হবি ভাইয়ের মুখে শোনা অতৃপ্ত আত্মাদের ঘোড়া, এ-বিশ্বাস নিয়েই হাসপাতালের বিছানায় আবার ঘুমিয়ে পড়ল তুহিন।

ওকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হলো আরও আঠারো ঘণ্টা পর। শেরে বাংলা হলে ওকে পৌঁছে দিল দুলাল। পথে আসতে আসতে তুহিনকে অনেক সাহস জুগিয়েছে সে। বলেছে, 'দেখ, তুহিন। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। তুইও বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিস। অবশ্য বিজ্ঞান যে সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে তা কিন্তু নয়। তবে নিশ্চিত থাক, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। তুই সেদিন খুব মানসিক অবসাদে ভুগছিলি। অইসব মুহূর্তে কোন বিভ্রম ঘটতেই পারে। দেখার, শোনার।'

কিন্তু বিজ্ঞানকে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না তুহিন। ও শুধু দেখতে চায়, নিশ্চিত হতে চায়, করিম বলে কেউ সত্যি সত্যি আছে কিনা। কেননা রিকশা টানা ঘোড়া আর সে একই ব্যক্তি।

হলে ফিরে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেই, বন্ধুদের নিয়ে ও গেল করিমের বাসায়। করিম তো নাইট গার্ড, তাই দিনের বেলা সে হলে বড় একটা আসে না। বন্ধুরা করিমের বাসা চেনে না, কিন্তু তুহিন চেনে। কেননা অনেকদিন ওর বাসায় গেছে গাঁজাখুরি গল্প শোনার জন্য। ওর আউলবাউল গল্প শুনলে মনটা বেশ হালকা হয়ে যায়।

তুহিন নিশ্চিত, করিম ভূত। ওকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনের গভীর তলদেশ থেকে ও প্রার্থনা করছিল, করিম যেন ভূত না হয়। ওকে যেন বাসায় যেয়েই দেখতে পায়। ও ভীষণ ভালবাসে করিমকে। মানুষটি গরীব, নিরীহ, কিন্তু উদার। এই বিশ্ববিদ্যালয় ওর অনেক জমি খেয়েছে।

অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে করিমের বাসায় পৌঁছুল সবাই। এবং ভেতরে ঢুকে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল ওরা। দিব্যি তবিয়তে বেঁচে আছে করিম। সত্যিকারের করিম। একচুলও সন্দেহ নেই তাতে। তুহিনের দেখা, চেনা, হাসিতে ভরা, বাউল গল্প শোনানো সেই আদি ও অকৃত্রিম করিম। তবে কিছুটা অসুস্থ। জ্বরে ভুগছে। সেই সঙ্গে খুসখুসে কাশি। কে জানে গাঁজা টানার কারণে ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে কি না।

যথারীতি আপ্যায়ন করল করিমের বৌ। নিয়ে এল তালের টাটকা রস। এটা করিমের কড়া নির্দেশ, তুহিন ভাই এলেই তাকে দিতে হবে তালের অথবা খেজুরের রস।

ওদের আসার খবর শুনে ক্লান্ত শরীরে বিছানা ছেড়ে উঠে এল করিম। তুহিনের মুখে সবকিছু শুনে হাসতে গেল, কিন্তু কাশির কারণে পারল না। জানাল, না, গত তিনরাত হলে যেতে পারেনি সে: ভীষণ জ্বরে ভুগছে।

অর্থাৎ অই ঘোড়া ধরা রাতে গুমটি ঘরে করিম ছিল না ডিউটিতে। তা হলে কে ছিল? আদৌ কেউ ছিল কিনা তাই বা কে জানে। করিম জানাল, ওর বদলি হিসেবে কাউকে পাওয়া যায়নি, তাই কারও না থাকারই কথা।

তুহিনের বন্ধুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেউ মুচকি হাসল। কেউ চোখ টিপল। আর করিমের বৌয়ের কাছে রসের বদলে তাড়ির আব্দার ধরল। করিমের বৌ হাসিমুখে তা পরিবেশন করল। তুহিনও যোগ দিল আসরে। একটু নেশা দরকার। ভুলে যেতে হবে সে রাতের স্মৃতি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

অসুস্থ শরীর নিয়েই করিম ওদের পৌঁছে দিল বিনোদপুরে। তারপর সেখান থেকেই বিদায় নিল। আজও সে যেতে পারবে না ডিউটিতে।

হবি ভাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল সবাই। হবি ভাই তখন ধেনো টেনে বেশ মুডে আছে। বানাল পান সবার জন্যে নিপুণ হাতে। ধরিয়ে দিল আগুন সবার সিগারেটে। কিন্তু ঘোড়া সম্পর্কে কোন কথা বলল না। তুহিন বুঝল, হবি ভাইয়ের কানে সে রাতের কথা এখনও পৌঁছেনি। যাক। ভালই হয়েছে। এখন আর গল্প শোনার বা শোনাবার অবস্থা নেই ওর। এখন ও চাচ্ছে একটা একটানা স্বপ্নবিহীন লম্বা ঘুম। মাথায় এখনও ঘুরছে ঘোড়া! বিনোদপুরের ঘোড়া! এটাকে বিদায় করে দিতে হবে মাথা থেকে।

বাবুল আলম

রং-তুলিতে রক্ত

চেক না করায় বুঝলাম বিনা টিকিটেও আসা যেত। টিকিট কেটে টাকা নষ্ট করার জন্যে মনের ভেতরটা খচখচ করতে লাগল।

বিশাল ক্যাম্পাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভা আমাকে মুগ্ধ করল। একদিনের মধ্যে আমার পরীক্ষা শেষ হওয়ায় মন খারাপ করে তিনটার ট্রেন ধরার জন্যে রিকশায় উঠলাম। শম্বুকগতিতে রিকশা চালিয়ে রিকশাওয়ালা চাচা সাড়ে তিনটার দিকে আমাকে রেল স্টেশনে নিয়ে এল। 'নয়টার ট্রেন ক'টায় ছাড়ে' জানা নেই, ভাবলাম দেরি হলেও ট্রেন পাব। কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তিনটের ট্রেন তিনটেতেই ছেড়ে গেছে। আজকের পরীক্ষার্থী অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ওই ট্রেনে চলে গেছে। হতাশ হয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কীরে দোস্ত, কী খবর? তিনটের ট্রেন ধরতে পারিসনি?'

তাকিয়ে দেখি আমার কলেজ জীবনের বন্ধু শিপন। আমি ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তোর তো তিনটের ট্রেনে যাওয়ার কথা। তুই এখানে কেন?'

'দেখতেই তো পাচ্ছিস। ট্রেন মিস।',

'এখন কী করা যায়? ভার্সিটিতে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।' শিপন বলল, 'চল, কাউন্টারে শুনে আসি। পরীক্ষা উপলক্ষে মাঝে মাঝে বিশেষ ট্রেন ছাড়ে। তেমন একটা পেয়ে গেলে ভাল।' যত রাত হোক, খুলনা পৌঁছাতে পারলে বাড়ি যাওয়া যাবে।

কাউন্টার আমাদের আশ্বস্ত করল। কারণ বিকেল সাড়ে চারটায় একটি বিশেষ ট্রেন ছাড়বে। যথারীতি ট্রেন আসল। আমরা দুজনে একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় উঠলাম। এবার আর টিকিট কাটার মত 'ভুল' করলাম না। তবে ট্রেনে উঠে হকচকিয়ে গেলাম। পুরো ট্রেন ফাঁকা। এখানে ওখানে দুচারজন বয়স্ক লোক শুয়ে-বসে আছে। টিকিট না কাটার জন্যে মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। এত অল্প লোকের মধ্যে অবশ্যই টিকিট চেক করবে।

শিপন আর আমি রেজাল্ট, পড়াশোনা এবং পরিশেষে প্রেম বিষয়ক আলাপ-আলোচনা করে পথযাত্রার ক্লান্তি কাটাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে নিকষ কালো আঁধারের রূপ দেখতে লাগলাম।

রাত তখন বারোটা। হঠাৎ এক নিস্তব্ধ, লোকজনবিহীন স্টেশনে থামল ট্রেন এবং চেকার ঘোষণা দিল, ট্রেন এখান থেকে আর যাবে না। কারণ কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছে যে তিনটার ট্রেন এই স্টেশন থেকে এক স্টেশন আগে লাইনচ্যুত হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে। দুটো ভর্তি পরীক্ষার্থী ছেলে মারাও গেছে।

ট্রেনের আরোহীরা খবরটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিল। মেনে না নিয়েও উপায় নেই। আশেপাশে যাদের বাড়ি তারা অন্ধকারের নির্জনতাকে ভেদ করে বাড়ির পথে রওনা হলো। কেউ কেউ বিছানাপত্র, ব্যাগ, ইত্যাদি গুছিয়ে ট্রেনের ভেতর শোয়ার আয়োজন করতে লাগল। আমিও দ্বিতীয় পদ্ধতিটির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে শোয়ার আয়োজন করতে লাগলাম।

শিপন পাউরুটি ও কলা কিনতে নীচে গিয়েছিল, ফিরে এল বেশ উত্তেজিত ভাবে। এসেই আমাকে বলল, 'দোস্ত, একটা ভাল খবর আছে। একটু হেঁটে গেলেই আমার বড় চাচার বাড়ি। চল, ওখানে আজ রাতটা কাটিয়ে সকালে হয় ট্রেনে নতুবা গাড়িতে করে খুলনায় যাওয়া যাবে।'

আমি ভাবলাম সারারাত এই ভূতুড়ে স্টেশনে মশার কামড়ে রাত কাটানোর চেয়ে ওর চাচার বাড়িতে যাওয়াই ভাল। সেখানে হয়তো আমার বয়সী ওর কোন চাচাত বোন পেয়ে যাব। তার সাথে প্রেম হলেও হতে পারে। তা ছাড়া সকালে হয়তো টিকিট চেকার টিকিট দেখতে চাইতে পারে। এখনই কেটে পড়া ভাল।

স্টেশনের ছোটখাট দোকানের টিমটিমে আলো ছাড়িয়ে আসতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমাদের দুজনকে গ্রাস করল। অন্ধকারের বর্ণনা দিতে ভাল্লাগছে না। অমাবস্যার রাতে চারদিকে গাছ বেষ্টিত ঘরবাড়িবিহীন বন যে কেমন হয় তা আপনাদের অজানা থাকবার কথা নয়। কালো পীচের মত অন্ধকারে নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। ভয় ভয় করতে লাগল। পাশেই শিপনের পদশব্দ শুনতে

পাচ্ছি। তবু ভয় কাটানোর জন্যে শিপনকে ডাকলাম, 'শিপন। অন্ধকারে তো কিছুই দেখছি না।'

শিপন হো হো করে হেসে উঠল। নীরব রাতে সে হাসি শুনে গা কেমন শিরশির করতে লাগল। ওর হাসি কেমন অস্বাভাবিক মনে হলো।

শিপন বলল, 'যা অন্ধকার, তুই যে দেখতে পাবি না সে তো জানা কথা।'

আমি একটু রাগত স্বরে বললাম, 'আর তুই বুঝি খুব দেখতে পাচ্ছিস?'

ও আবার সেই গা শিরশিরানি হাসি দিয়ে বলল, 'দোস্ত, আমি কিন্তু ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি। আমি আগে আগে হাঁটছি তুই আমার হাত ধর।'

আমি ওর হাত ধরতেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। মরা মানুষের হাতের মত শীতল সে হাত। বেশ কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু আত্মহত্যা করেছিল। ও মরার পর ওর লাশে হাত দিয়ে যে অনুভূতি আমার হয়েছিল এখন ঠিক সে অনুভূতি হলো। আমি বুঝলাম কোথাও একটা ভুল হয়েছে। ওর অসংলগ্ন কথাবার্তা, হাসি, শীতল হাত আমাকে ভাবনায় ফেলে দিল। আমি স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে বললাম, 'কীরে, আর কতদূর? কম তো হাঁটলাম না! পা ব্যথা করছে যে!'

'এই তো প্রায় এসে গেছি। শোন, আমার চাচা সম্বন্ধে তো তোকে কিছুই বলা হয়নি। হঠাৎ তাঁকে দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারিস।'

'কেন, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বা দানব নাকি তোর চাচা?'

'আসলে চাচার কাজকর্ম বেশ উদ্ভট। শিল্পী মানুষ তো। শুধুমাত্র ছবি আঁকার জন্যে চাচা এই অজ পাড়া গাঁয়ের বনের মধ্যে প্রাসাদতুল্য এক বাড়ি বানিয়েছেন। চিত্রাংকনকে ভালবেসেছেন বলে বিয়ে করেননি। মাত্র ক'জন চাকরবাকর নিয়ে আজ পাঁচ বছর এখানে পড়ে আছেন।'

'তোর চাচা যদি আজ বাড়ি না থাকেন?'

'থাকবে তো অবশ্যই। বাড়ি না থেকে কি উপায় আছে। বাইরের পৃথিবীর সাথে তো তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন।'

আমি চুপ করে গেলাম।

হঠাৎ শিপন বলল, 'এই তো, আমরা এসে গেছি। সামনে তাকা।'

সামনে তাকিয়ে আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। চোখ সওয়া অন্ধকারে দেখলাম বিশাল একটা দোতলা বাড়ি। কিন্তু একটু আগেও তো ওখানে কোন বাড়ি দেখিনি। হয়তো আমার চোখের ভুল।

শিপন বাড়ির গেটের বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে বলল, 'তুই একটু দাঁড়া। আমি চাচাকে ডেকে নিয়ে আসছি। এতরাতে চাকরবাকররা মনে হয় সব ঘুমিয়ে পড়েছে। অকস্মাৎ শিপন আমার সামনে থেকে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। চারিদিকে কবরের নীরবতা। এই নীরবতা অসহনীয়। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে জ্ঞান হারাব আমি। হঠাৎ কারও পদশব্দে চমকে

সামনে তাকালাম। মোমবাতি হাতে বাড়ির সামনে প্যাসেজ ধরে হেঁটে আসছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর মাথার চুল পুরোটা সাদা, মুখভর্তি সাদা দাড়ি, পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী। এরকম মানুষকে দেখলে এমনিই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক পরিবেশে বৃদ্ধকে দেখে শ্রদ্ধার বদলে মনে জন্মাল অজানা ভয়।

'এসো, বাছা, এসো। তোমার জন্যে এই পাঁচ বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি। আমার ছবির বাকি কাজগুলো শেষ করতে সত্যি অনেক রঙ প্রয়োজন।'

মনে হলো আমার কণ্ঠস্বর অসাড় হয়ে গেছে। এসব কী শুনছি আমি! তবু অনেক সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'শিপন কোথায়?'

'তোমাকে নিয়ে আসতে ওকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শিপনকে কী দরকার, আমি তো আছি। এসো বাছা, আমার হাত ধরো।'

আমি চাচার হাত ধরলাম। সেই মৃত মানুষের হাতের মত শীতল হাত। মনে হলো বরফ ধরেছি। তবুও এবার আর চমকালাম না। কারণ চমকাবার মত অনুভূতি আমার নষ্ট হয়ে গেছে। এগিয়ে চললাম শীতল হাত ধরে।

দোতলায় চাচার ছবি আঁকার ঘর। চাচা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। এ বাড়িতে ঢুকে একটা জিনিস লক্ষ করছি–কোথাও কোন শব্দ নেই।

বাকি যেটুকু বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তা পেলাম ছবি আঁকার ঘরে ঢুকে। চাচা বললেন, 'তুমি ছবিগুলো দেখো। আমি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।' তিনিও যেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অগত্যা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। যে পরিবেশে আমি আছি তাতে রক্ত দিয়ে আঁকা ভৌতিক ছবিগুলো মোমবাতির আলোতে বেশ স্বাভাবিক মনে হলো। তবে ছবিগুলো দেখে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হলাম যে ছবিগুলো আমার পরিচিত পৃথিবীর নয়। এ অন্য এক পৃথিবীর ছবি, যে পৃথিবীর সাথে দেখা শুধু মৃত্যুর পরই ঘটে।

এগিয়ে গেলাম ছবি আঁকার সরঞ্জামের দিকে। রঙ রাখার পাত্রে বেশ ক'দিন আগে রাখা রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। একই অবস্থা হয়েছে তুলি ও ছুরির।

পাশের ঘরে হঠাৎ যেন কাদের ফিসফিসানি শুনলাম। কান খাড়া হয়ে গেল। দেয়ালে কান পেতে স্পষ্ট শুনতে পেলাম ও পাশের কথোপকথন।

'এই না হলে আমার ভাতিজা। তোকে কী দিয়ে যে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না। রক্তের অভাবে এ ক'দিন আমার মাথা খারাপের মত অবস্থা। এক ফোঁটা রক্ত নেই, ছবির কাজ শেষ করতে পারছিলাম না, অস্থির অস্থির লাগছিল। চলে গেলাম রেল স্টেশনে। তুই তো জানিস আমার শক্তি কেমন? দিলাম বগি ওলট-পালট করে। আশা যদি কোন আহতকে ধরে আনতে পারি। কাজ সম্পন্ন হলো ঠিকভাবে। কিন্তু নিহত দুজনের একজনকে দেখে চমকে উঠলাম। তুই মরে পড়ে আছিস। অপরাধবোধ গ্রাস করল আমাকে। আমার স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে তোর এই অবস্থা। কিন্তু হবার তা তো হয়ে গেছে। তখনই বুদ্ধিটা মাথায়

এল। তোর আত্মার সাথে যোগাযোগ করে তোর একজন জীবিত বন্ধুকে তো ধরে আনতে পারি। যেই চিন্তা সেই কাজ।'

'চাচা কাজটা কখন করবে? এদিকে ভোর হয়ে আসছে তো।'

'আরে, তাই তো। একটুও খেয়াল করিনি। ছুরিটাতে শান দিতে হবে। রক্ত লেগে আছে।'

ও পাশে স্পষ্ট শুনতে পেলাম ছুরি শান দেয়ার শব্দ। আমাকে নিয়ে কী করা হবে তা আর বুঝতে বাকি রইল না। নিজের পরিণতি কী হতে চলেছে চিন্তা করে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। সেই সাথে রাগও হলো খুব। রাগে ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যেয়ে ওদের দুজনকে খুন করে ফেলি। সেটা মানুষ হলে হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু ওরা তো মানুষ না, পিশাচ।

হঠাৎ ক্যাচ করে দরজা খোলার শব্দ পেলাম। মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে দেখলাম বিশাল এক ছুরি হাতে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে একটু একটু করে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে পিশাচ চাচা। আমি পিছতে লাগলাম। দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গেল। পিশাচটা এগিয়ে আসতে লাগল আমার সামনে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। গলার কাছে অনুভব করলাম পিশাচটার ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া। ওই মুহূর্তে জ্ঞান হারালাম আমি।

পরবর্তী অংশটুকু শোনা ঘটনা। ওই গ্রামের দু'জন লোক খুব ভোরে বনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে দেখতে পায়। তারা আমার পকেট থেকে ঠিকানা নিয়ে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দেয়। বাড়িতে এসেই কঠিন জ্বরে ভুগি। জ্বরের ঘোরে আমি নাকি 'রক্ত রং!' এসব প্রলাপ বকতে থাকি। সপ্তাহ তিন জ্বরে ভুগে সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর জানতে পারি, ঘটনার দিন শিপন তিনটের ট্রেনে বাড়ি আসতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। পাঁচ বছর আগে ঠিক একই জায়গায় ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান শিপনের বড় চাচা যিনি পেশায় ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। আরও খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ওই গ্রামে বনের ভেতর বা আশপাশে কোথাও কোন পাকা দোতলা বাড়ি নেই।

এই হচ্ছে আমার ভূতের গল্প। কেমন লাগল গল্পটা?

প্রিন্স আশরাফ

প্রেতাত্মা

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। কালো মেঘে ঢেকে আছে আকাশ–দেখে মনে হয় কেউ যেন আকাশে ঢেলে দিয়েছে এক দোয়াত কালি। উদ্বিগ্ন চোখে বাইরে তাকাচ্ছে শুক্তি। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। এখনও ফিরল না আবরার। মনের মধ্যে তোলপাড় করছে দুশ্চিন্তা। কেন যে সকালে বেরোতে দিল তাকে! অবশ্য

আবরার বলেছিল বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু আকাশের যে অবস্থা—কী করে আসবে? রাস্তাঘাট কাদায় পিচ্ছিল হয়ে আছে। গাড়ি চালানোও রিস্কের ব্যাপার। তা ছাড়া, রাস্তাও ভাঙাচোরা। ইঁট বিছানো। কবে পিচ ঢালা হবে কে জানে! সরকার শুধু রাজধানীকেই তিলোত্তমা নগরী হিসাবে গড়ে তুলছে। মফঃস্বল শহর সেই আগের মতই আছে। শহরের ভিতরে থাকলে না হয় একটা কথা ছিল। শুক্তিরা থাকে শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে তেরখাদা নামক জায়গাটিতে। শুক্তি অবশ্য এখানে থাকতে চায়নি। তেরখাদা হোক না থানা সদর। কিন্তু পাড়া গাঁ ছাড়া কী বলা যায়? সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে নিস্তব্ধ হয়ে যায় চারদিক। বিদ্যুৎ রয়েছে, কিন্তু কখন আসে কখন যায় তার ঠিক নেই। গা ছমছম করা পরিবেশ। কেউ কি সাধ করে এখানে থাকতে আসে? কিন্তু আবরারের জিদের কারণেই থাকা।

সেনাবাহিনী থেকে হঠাৎ করে বরখাস্ত হলো আবরার। কর্মঠ এক মেজর ছিল সে। বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করে ইন্টার্নি শেষ হবার পর আর্মি মেডিকেল কোরে ক্যাপ্টেন হিসাবে যোগ দিল। সে বছরই বিয়ে করল শুক্তিকে। শুক্তি তখন রাজশাহী মেডিকেলে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। শুক্তি যে বার ডাক্তারী পাস করল, তার এক বছর পর প্রমোশন পেয়ে মেজর হলো আবরার। ইতিমধ্যে শুক্তির কোল জুড়ে এল মেয়ে সুপ্তা। দেখতে দেখতে চলে গেল কয়েকটি বছর। তারপর হঠাৎ করে বাধ্যতামূলক অবসর। কী কারণে এটা ঘটল তা বুঝতে পারেনি আবরার। সেই থেকে জিদ চাপল তার মনে। চলে যাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। বন্ধুদের কারও সাথে দেখা না করে পাঁচ বছরের মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সোজা চলে এল খুলনার তেরখাদায়। তারিক মেহেদী পারভেজ নামের এক লোকের কাছ থেকে জলের দামে কিনে ফেলল বাড়িটা। পুরোনো আমলের বাড়ি।

ভীষণ অভিমান হয়েছিল শুক্তির। দু'দিন কথা বলেনি স্বামীর সাথে। অনেকেই তো চাকরিচ্যুত হয়, বা হতে পারে। তাই বলে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে হুট করে ঢাকা ছেড়ে চলে আসা কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে? তা ছাড়া, আবরার একবারও চিন্তা করল না শুক্তির ক্যারিয়ারের কথা? মেয়ের ভবিষ্যতের কথা?

চোখের কোণে পানি জমল শুক্তির।

ঘরের মেঝোতে আপন মনে পুতুল নিয়ে খেলা করছে সুপ্তা।

এই জায়গায় ওর কোন খেলার সাথী নেই।

ঢাকাতে সুপ্তার সর্বক্ষণের সাথী ছিল বর্ষা। বর্ষার বাবা সৈয়দ আলী রেজা একজন শিল্পপতি। দু'পরিবারের মধ্যে কত দহরম মহরম। রেজা ভাইয়ের স্ত্রী শেলী ভাবী শুক্তিকে কত স্নেহ করতেন। ছোট বোনের আদরে ভরিয়ে দিতেন। সে কথা মনে করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করল শুক্তি। উঠে গেল ড্রইংরুমে। সোফার উপরে পড়ে থাকা জেফকর্টের লেখা গাইনী বইটা হাতে তুলে নিল। কত আশা ছিল জানুয়ারিতে এফসিপিএস পরীক্ষাটা দেবে। তা আর হলো না। হয়তো আর

কোনদিনই হবে না। যদিও আর দু'মাস পরেই জানুয়ারি। কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে একচুলও কোথাও নড়বে না আবরার। তার মান সম্মান বোধ অত্যন্ত টনটনে। ভাঙবে তবু মচকাবে না। নিজের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটে যেতে পারত সে। কিন্তু যায়নি। বাগেরহাটে পরিচিত জনদের মুখোমুখি হতে হবে। অনেকের অনেক কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তাই আবরার সবাইকে এড়াতে বেছে নিল অজানা অচেনা এই জায়গাটি। আবরারের মনের অবস্থা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত হার মানল শুক্তি। মাত্র একমাস এসেছে ওরা। এই এক মাসেই শুক্তি হয়ে উঠল পুরোদস্তুর গৃহিণী।

'মা, আব্বু ফিরবে কখন?' চমকে উঠল শুক্তি। সুপ্তা কখন কাছে এসে *দাঁড়িয়েছে টের পায়নি সে। মেয়েটা নিঃশব্দে হাঁটা চলা করতে শিখেছে। খুব বাজে* অভ্যাস। তবে এতটা চমকানো উচিত হয়নি, বুঝতে পারল শুক্তি।

'মা মনি,' শুক্তি জবাব দিল, 'তোমার আব্বু বোধহয় রাতে ফিরবে না। দেখছ না কী বৃষ্টি হচ্ছে। এসো মা মেয়েতে মিলে আমরা লুডু খেলি। তার আগে চা খাওয়া যাক, কী বলো? কিন্তু তুমি এক চুমুক, তার বেশি না। ঠিক আছে?'

লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাল সুপ্তা। মেয়ের চা খাওয়া পছন্দ নয় শুক্তির। এই বাজে অভ্যাসটা তৈরি করে দিয়েছে আবরার। কিন্তু শুক্তির কড়া নির্দেশ মেয়েকে এক চুমুকের বেশি চা খাওয়ানো চলবে না। চা খাওয়ার পর লুডু নিয়ে বসল ওরা। ইচ্ছে করে মেয়ের কাছে হারল শুক্তি।

'মা মণি, তুমি এবার একা খেলো। আমি রান্না করে আসি। আজ আমরা খিচুড়ি খাব, কেমন? খেয়ে দেয়ে লম্বা ঘুম।' শুক্তি উঠে দাঁড়াল।

'বাবা আসবে না তা হলে?' সুপ্তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

হেসে ফেলল শুক্তি। বাবার ন্যাওটা হয়েছে মেয়েটা।

'না, তোমার বাবা আজ আসবে না। সারা বাড়িতে আমরা দু'জন—কী মজা না?'

খাওয়াদাওয়া শেষ করে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বারান্দায় এসে বসল শুক্তি। রাত সোয়া ন'টা বাজে মাত্র। অথচ মনে হচ্ছে কী গভীর রাত। এখনও থামেনি বৃষ্টি। বাইরে অন্ধকার ছাপিয়ে একটানা বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে কখন চোখে ঘুম নেমে এসেছে টের পায়নি সে। আচমকা সজাগ হয়ে উঠল। বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে গায়ে। শীত শীত করছে। কী বিদঘুটে অন্ধকার। ঘুমের মধ্যেই কারেন্ট চলে গেছে। আজ রাতে আর আসবে না। কটা বাজে এখন? বারান্দা থেকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় এল সে। এবং বিছানায় উঠেই ধড়াস করে উঠল বুক। হাতড়াল সমস্ত বিছানা। সুপ্তা নেই।

'সুপ্তা!' ডাকল সে। প্রথমে আস্তে, তারপর গলা চড়াল।

কোন উত্তর নেই।

'সুপ্তা! মা-মনি! তুমি কি বাথরুমে?'

কোন সাড়া নেই। শুধু অন্ধকারে ভয়ার্ত, কর্কশ শোনাল শুক্তির কণ্ঠস্বর।

সুপ্তা পড়ে যায়নি তো মেঝেতে? ভাবল সে। না, তা কী করে হয়! ঘুমের মধ্যে নড়াচড়ার অভ্যাস নেই মেয়ের। ঘুমোলে একেবারে কাদা হয়ে থাকে।

অন্ধকার হাতড়ে টেবিলের কাছে গেল শুক্তি। হাতেই ঠেকল টর্চ লাইটটা। জ্বালতে গিয়েই মনে পড়ল ব্যাটারি শেষ হয়েছে গতকাল। ড্রয়ার খুঁজল। ম্যাচ পেল। কাঠি জ্বালিয়ে তাকাল বিছানার দিকে। শূন্য বিছানা। ড্রয়ার থেকে মোমবাতি বের করল। কাঁপা হাতে জ্বালল সে। ভয়ে ঢিপ ঢিপ করছে বুক। বাথরুমে গেল। কেউ নেই। ড্রই-রুমে এল শুক্তি। খালি ড্রইংরুম। পাশের ঘরে গেল। কোথাও নেই মেয়ে। 'সুপ্তা,' জোরে ডাকল শুক্তি। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে সে। 'মা-মণি তুমি জবাব দাও। আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি?'

কেউ উত্তর দিল না। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল শুক্তির। কাঁপছে। মনে হচ্ছে কাঁপুনির চোটে হাত থেকে মোমবাতি পড়েই যাবে। প্রতিটা ঘরে ঢুকল সে। অবশেষে পেল সুপ্তাকে। উত্তর দিকের একেবারে কোনার ঘরে। তোষক ও বিছানাবিহীন খাটের উপর গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে সুপ্তা। পুরানো জিনিসপত্রে ঠাসা ঘর। এরুমটা দরকার পড়ে না শুক্তিদের। মাত্র তিনজন মানুষ ওরা। এত রুম কী কাজে আসবে? রুমটা পরিষ্কারও নয়। মেহেদী সাহেবের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সরাতে মন চায়নি শুক্তির। কিন্তু সুপ্তা এ ঘরে এল কী মনে করে? মোমবাতিটা টেবিলে সন্তর্পণে রেখে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল শুক্তি। এখনও বুক ধড়াস ধড়াস করছে ভয়ে।

সুপ্তাকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময়ই মনে পড়ল ওর ঘরটা তো তালা মারা ছিল। তা হলে সুপ্তা খুলল কী করে? তা ছাড়া ছিটকিনিও অনেক উপরে। চেয়ারের উপর দাঁড়িয়েও সুপ্তার পক্ষে তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো দরজা খোলাই ছিল—পরমুহূর্তে ভাবল সে।

পরদিন দুপুর বেলা এল আবরার। 'বুঝলে, একেবারে আটকা পড়েছিলাম। সারাদিন রাত এত বৃষ্টি! নাজমুলের সাথে দেখা হলো। ওর বৌ সুরভীর সাথে দেখা করাতে বাসায় নিয়ে গেল। ছাড়লই না ওরা। জানো, এ মাসেই আমেরিকা চলে যাচ্ছে…'

'তোমার কৈফিয়ত শুনতে চাচ্ছি না,' শান্তস্বরে বলল শুক্তি। 'তোমার মেয়ে পুতুল নিয়ে খেলছে। ওকে আদর করোগে যাও।'

'মনে হচ্ছে ভীষণ রেগে আছ আমার উপর। এক্ষুণি রাগ ভাঙিয়ে দিচ্ছি।'

আবরারকে এগোতে দেখে পিছিয়ে গেল শুক্তি। 'আহ্লাদ দেখাতে হবে না। রান্নাঘরে কাজ পড়ে আছে,' আবরারকে পাশ কাটিয়ে স্যাঁৎ করে সরে গেল শুক্তি।

'বুঝলে? দারুণ একটা প্ল্যান এঁটেছি।' ভাত খেতে খেতে বলল আবরার। তাকাল শুক্তির দিকে। কিন্তু 'দারুণ প্ল্যান' শোনার কোন আগ্রহ দেখা গেল না তার ভেতর।

আবরার বলে চলল, 'বারাসাতের ওদিকে অনেক জমি পড়ে আছে। সস্তা। চিন্তা করলাম কিনে ফেলব। জহুরুল ইসলামের মত ফ্ল্যাট বাড়ি বানাব। বিশাল বিশাল বাড়ি হবে। গ্রামটা হয়ে উঠবে লন্ডন শহরের মত। তাক লাগিয়ে দেব সবাইকে।'

'হুঁ।' তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিল শুক্তি।

'তারপর এখানে গড়ব বিশাল হাসপাতাল। মাদার তেরেসার নামে। তুমি হবে এর কর্ত্রী। বড় বড় ডাক্তার নিয়ে আসব। চেহারাই পাল্টে যাবে গোটা এলাকার। খুলনার একটা পাড়া গাঁ হয়ে উঠবে খুলনার প্রাণ কেন্দ্র। দারুণ হবে, তাই না?'

কোন কথা না বলে উঠে গেল শুক্তি। হো হো করে হাসল আবরার। মেয়েরা সহজে কিছুই বুঝতে চায় না। আপন মনে বলল সে।

বিকেলে শুক্তি ও সুপ্তাকে নিয়ে নীচের লনে এল আবরার। চমৎকার ফুলের বাগান। এত সস্তায় এত বিশাল একটা বাড়ি পেয়ে গেছে ভাবতেই খুশি হয়ে উঠল ওর মন। হোক না পুরোনো। কিন্তু কী সুন্দর। চারপাশে কত জায়গা। মেয়ে খেলতে পারবে এখানে। ক্রিসমাস ট্রী, পামট্রী, ঝাউ, ডেসমোনিয়া, পাতাবাহার, দোপাটি, কত ধরনের গাছ। মনে মনে মেহেদী সাহেবের প্রশংসা করল ও। ভদ্রলোক প্রচুর গাছ লাগিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে সব বিক্রি করে দিয়ে কেন যে চলে গেলেন উনি ভেবে পায় না আবরার।

'তোমার খারাপ লাগছে জানি,' রাতে বিছানায় স্ত্রীর হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল আবরার। 'কিন্তু আমার মনে কী ঝড় বইছে তুমি জানো না। অপমানের কথা ভুলতে পারছি না আমি। শহরে সিটি কলেজের সামনে দেখা হয়েছিল মেজর নান্নুর সাথে। আমাকে দেখতে পায়নি। ওকে না দেখার ভান করেই কেটে পড়লাম। কী যে যন্ত্রণা আমার।'

'আমি জানি।' স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিল শুক্তি। 'আমি বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। তুমি যে সিদ্ধান্তই নেবে, আমার দ্বিমত থাকবে না। তোমার সাথে নরকেও থাকতে আমি রাজি।'

'তুমি পড়তে থাকো,' আবরার বলল। 'জানুয়ারিতে ঢাকা গিয়ে এফসিপিএস দিয়ে আসবে।'

'এসব তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজেকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই। ভয় সুপ্তাকে নিয়ে।'

'সামনের মাসে দেখি ওকে স্কুলে ভর্তি করানো যায় কিনা।'

'সে কথা বলছি না।' গতরাতের কথা মনে পড়ল শুক্তির। ভয়ের শিরশির অনুভূতি মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল ওর।

'তা হলে?'

'না কিছু না। তুমি ঘুমাও।' স্বামীকে বলতে চায় না শুক্তি। এমনিতেই তার মাথায় কত চিন্তা।

*

'এই ওঠো তো,' স্বামীকে ঠেলছে শুক্তি। রাত দুটো বাজে ঘড়িতে।

'কী হলো?' ঘুম ঘুম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আবরার।

'সুপ্তা বিছানায় নেই।' কেঁপে উঠল শুক্তির কণ্ঠ।

'বাথরুমে গেছে হয়তো।'

'না বাথরুমে যায়নি, তুমি ওঠো!' স্ত্রীর কণ্ঠে উত্তেজনা লক্ষ করে বিছানায় উঠে বসল আবরার। শুক্তি বলল, 'ও কোথায় গেছে আমি জানি। উত্তর দিকের কোণার রুমটায়।'

'তাতে কী? চলে আসবে।' নিরাসক্ত কণ্ঠে আবরার হাই তুলল।

'না, তুমি ওঠো। চলো আমার সাথে।'

বিরক্ত মুখে বিছানা ছেড়ে নামল আবরার। দু'জনে গেল উত্তর দিকটায়। অন্ধকার ঘর। লাইট জ্বালল সুইচ টিপে। দেখল খাটের উপর ঘুমিয়ে আছে সুপ্তা। পাশে দোমড়ানো মুচড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে প্লাস্টিকের পুতুলটা।

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছিলে,' শুক্তিকে লক্ষ করে বলল আবরার।

ঘেমে উঠেছে শুক্তি। 'না, শুধু শুধু দুশ্চিন্তা নয়,' কেঁপে উঠল ওর কণ্ঠ।

'ও এখন বড় হচ্ছে।' হাসল আবরার। 'বাবা-মার সাথে এক বিছানায় থাকা ঠিক নয়—এ ধরনের চিন্তা ওর মাথায় এসেছে, তাই চলে এসেছে এরুমে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল শুক্তি। 'রুম তো আরও ছিল।'

'খামোকা ভাবছ তুমি। হয়তো এ রুমটাই ওর পছন্দ।'

মাথা নাড়ল শুক্তি। ওর কপাল বেয়ে ঘাম নেমে এল।

সুপ্তাকে নিয়ে এল নিজেদের বিছানায়। অঘোরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা।

'তুমি একটু বাইরে এসো। কথা আছে।' স্বামীকে হাত ধরে টেনে বারান্দায় নিয়ে এল শুক্তি। 'এ নিয়ে দু'বার।' ফিসফিস করে বলল সে। 'দু'বার গিয়েছে ও রুমে।'

'যেতে পারে,' কোন অনুভূতি প্রকাশ পেল না আবরারের কণ্ঠে।

'কিন্তু রুমটা বন্ধ থাকে,' শুক্তির কণ্ঠ উত্তেজিত।

'আহা, ছিটকানি খুলতে পারে তো।' বিরক্তি সহকারে বলল আবরার।

'না পারে না।' দৃঢ় কণ্ঠ শুক্তির। 'কত বড় দরজা দেখেছ? চেয়ার দিয়েও ওর নাগাল পাবার কথা না।'

'হয়তো ছিটকিনি খোলা ছিল।'

'আবরার!' ফিসফিস করে বলল শুক্তি, 'দরজায় শুধু ছিটকিনি দেয়া ছিল না। গতরাতে এঘটনা ঘটার পর দিন আমি নিজে তালা মেরে রেখেছিলাম। চাবি আলমারির মধ্যে। আমার ভয় করছে।'

'যাহ। এরকম হতে পারে। হয়তো ভুল করেছ তুমি। তালা মারোনি। টেনশানে আছ তো। শুধু উল্টোপাল্টা ভাবনা।'

'আমার কথা বিশ্বাস করছ না, না?'

'করছি। চলো তো শুতে যাই।'

সারারাত এক ফোঁটা ঘুমোতে পারল না শুক্তি। শোবার সাথে সাথেই আবরার ঘুমিয়ে পড়ল। কেন কে জানে অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল শুক্তি। দেয়াল ঘড়িতে রাত তিনটা বাজল। পেঁচা ডেকে উঠল যেন কোথায়। বিছানা ছেড়ে উঠল শুক্তি। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাইরে চমৎকার চাঁদের আলো। উথাল পাতাল জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। মনোমুগ্ধকর এ দৃশ্য কিছুক্ষণ উপভোগ করল শুক্তি। 'খামোকাই চিন্তা করছি আমি।' ভাবল সে। ফিরে আসবে, এমন সময় শুনতে পেল শব্দটা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। ছোট ছোট পা ফেলে কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে ওপাশে। দুষ্টু মেয়েটা আবার উঠেছে? ঘুরে উত্তর পাশে চলে এল ও। না, কেউ নেই। দরজাটা বন্ধ। ফিরে এল ঘরে। বাবা ও মেয়ে ঘুমোচ্ছে। 'ভুল শুনেছি আমি।' আপন মনে বলল শুক্তি। 'এসব আমার কল্পনা।'

সকাল বেলা প্রচণ্ড জ্বর এল সুপ্তার। হঠাৎ করে জ্বরের কারণ খুঁজে পেল না শুক্তি। আবরারও চিন্তায় পড়েছে। ঘরে প্যারাসিটামল ছিল। খাওয়ানো হলো। দু'দিনেও জ্বর কমল না। তিনদিন না গেলে এন্টিবায়োটিক দেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই একশো পাঁচ ডিগ্রি উঠল। ম্যালেরিয়ার লক্ষণের সাথেও মিলছে না। ম্যালেরিয়াতে শরীরের তাপমাত্রা পিক পয়েন্টে উঠে আবার বেজ লাইনে চলে আসে। অথচ সেরকম হচ্ছে না। টাইফয়েডও নয়। ভাইরাল ফিভার হতে পারে, ভাবল শুক্তি। তবু এমক্সিসিলিন সিরাপ খাওয়াল সুপ্তাকে। কিন্তু বমি করেই ফেলে দিল। রাতে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। জ্বর তো কমলই না, বরং আবোল তাবোল বকা শুরু করল সে। 'মা-মনি আমি মারা যাচ্ছি!' ঠোঁট কাঁপছে সুপ্তার। নীল হয়ে যাচ্ছে শরীর।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল শুক্তির। 'না, সোনা মনি। তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।' মাথায় পানি ঢালছে সে।

'না আমি ভাল হব না।' মাথা ঝাঁকাচ্ছে সুপ্তা। জ্বরে কাঁপছে শরীর।

কী করা যায়? ভাবছে আবরার। স্বামী-স্ত্রীর দু'জনেই ডাক্তার। আর তাদের মেয়ের জ্বর একশো পাঁচ-এর নীচে নামছে না।

'মা!' ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল সুপ্তা।

'কী সোনা মণি?' শুক্তি জড়িয়ে ধরল মেয়েকে।

'আমাকে একটু ওই ঘরে নিয়ে যাও।'

'কোন ঘরে?'

'তিতলির ঘরে।'

'তিতলি? কে সে?' গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শুক্তির।

'আমার বান্ধবী।'

'জ্বরে প্রলাপ বকছে,' বিড় বিড় করে বলল আবরার।

'মা, আমাকে নিয়ে চলো!' এবার জোরে চিৎকার করল সুপ্তা।

শুক্তি তাকাল স্বামীর দিকে।

'মা, নিয়ে যাও আমাকে। আমি তিতলির কাছে যাব!' আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে

চেঁচিয়ে উঠল সুপ্তা এবং পরক্ষণেই জ্ঞান হারাল।

'তুমি মোখলেস সাহেবকে ডেকে আনো।' কাঁপা কণ্ঠে আবরারের দিকে তাকাল শুক্তি।

'মোখলেস সাহেব কচু করবে।' মুখ বাঁকাল আবরার।

মোখলেসুর রহমান স্থানীয় ডাক্তার। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এখানে এমবিবিএস ডাক্তার নেই। বয়স ষাটের কাছাকাছি। এখানকার লোকজন মোখলেস ডাক্তার বলতে অজ্ঞান।

'আমাকে লজ্জায় ফেললে তোমরা।' মোখলেস সাহেব এসে পরীক্ষা করছেন সুপ্তাকে। 'তোমরা হলে পাস করা ডাক্তার। আমি হাতুড়ে।'

'তবু আপনি অভিজ্ঞ লোক,' বলল শুক্তি।

'জ্বর কখন এসেছে?' জিজ্ঞেস করলেন মোখলেস সাহেব।

আগাগোড়া সব বলে গেল শুক্তি। তিতলির প্রসঙ্গও বাদ দিল না। স্বামীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দু'রাত যে সুপ্তা বদ্ধ ঘরটায় ছিল সে কথাও বলল। সব শুনে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল মোখলেস সাহেবের। শুক্তি ও আবরারের দিকে তাকালেন তিনি। তাকালেন বিছানায় শোয়া সুপ্তার দিকে। 'মা,' শুক্তির উদ্দেশে বললেন তিনি।

'জানি না আমার কথাগুলো কীভাবে নেবে তোমরা। তোমরা এযুগের মানুষ। আমি পুরোনো আমলের লোক। তোমরা হয়তো হাসবে আমার কথা শুনে। তবু বলি। এখানে আর থাকা ঠিক হবে না তোমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আমার বিশ্বাস এ বাড়িতে থাকলে অমঙ্গল হবে তোমাদের।'

আবরারকে হাসতে দেখে মোখলেস সাহেব আবার বললেন, 'এই বাড়িটা এক সময় জমিদারের বাড়ি ছিল। অনেক আগের কথা সেটা। ক্রমে জমিদারী প্রথা উঠে গেলে এ বাড়ি কিনে নেন এক ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু এক মাসের মধ্যে কাউকে না বলে চলে যান তিনি। আর আসেননি। অনেক পরে তাঁর এক ভাই এসে বাড়িটা দখল করে। তার আগে গ্রামের আড্ডাবাজ ছেলেরা এখানে আড্ডা দিত। মদ, গাজা খেত। পুলিস তাদের বের করে দেয়। ওই ভাইয়ের অবশ্য এখানে থাকা হয়নি। তিন মাসের মাথায় তাঁর স্ত্রী বললেন বাড়িটা নাকি ভুতুড়ে। বাড়ি ছেড়ে চলে যান তাঁরা। পরিত্যক্ত হয়ে যায় বাড়িটি। প্রকৃত মালিকের অভাবে সরকার বাড়িটা নিয়ে নেয়। তালা মারাই থাকত। পরে মেহেদী সাহেব সরকারের কাছ থেকে নিলামে বাড়িটা কেনেন। কিন্তু দেখলে তো উনিও দু'বছর পর বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন তোমাদের কাছে।'

'হয়তো ভাল লাগছিল না এতদিন এখানে থাকতে,' আবরার বলল। 'দু'বছর তো কম সময় নয়। আমি, আমি বিশ্বাস করি না এসব ফালতু কথায়।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাস তোমার কাছে, বাবা।' মোখলেস সাহেব ফিরে যাবার ইচ্ছা

প্রকাশ করলেন। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাল শুক্তি। ভদ্রলোক এত রাতে কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন।

মোখলেস সাহেব বললেন, 'যখনই প্রয়োজন মনে করবে এই বুড়ো মানুষটাকে ডাকবে। তোমাদের মেয়ের জন্যে আমি কোন ওষুধ দিয়ে গেলাম না। তোমরাই ভাল বুঝবে।'

মোখলেস সাহেব চলে যাবার পর শুক্তির সাথে অনেকক্ষণ ঠাট্টা করল আবরার। কিন্তু শুক্তি সায় দিল না ঠাট্টাতে। ভৌতিক কোন কিছুতে ওর বিশ্বাস নেই সত্যি, কিন্তু এসব ঘটছে কেন?

সকালে সুপ্তার জ্বর ছেড়ে গেল। উঠে হাঁটতে খেলতে পারছে সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল শুক্তি। আবরার চলে গেল জমি দেখতে। আবরার যাবার পর সুপ্তাকে নিয়ে বসল সে। ওর মাথা থেকে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। 'মা-মণি, খেলবে তুমি?' মেয়েকে শুধাল ও।

'না। তোম্মার সাথে খেলব না।'

'তিতলির সাথে খেলবে?' মেয়ের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরখ করল শুক্তি।

'তিতলি কে?' অবাক হয়ে তাকাল সুপ্তা।

থাক। স্বস্তিটুকু গোপন করল শুক্তি। অযথা টেনশান করছিল ও।

'না, কেউ না। এমনি বললাম।' হাসল সে। চুমু খেল মেয়ের গালে।

'তুমি একা একা খেলো। আমি কাপড় চোপড় ধুতে যাই,' বলে বাথরুমে ঢুকল শুক্তি। কাপড় কাচছে আর হাসি পাচ্ছে তার গতরাতের কথা মনে করে। ইস কী ভয়টাই না পেয়েছিল। আবরারের কথাই ঠিক। শুধু শুধু চিন্তা করছে সে। সুপ্তার অকস্মাৎ চিৎকারে চমকে উঠল শুক্তি। দৌড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে। সুপ্তা পড়ে আছে মেঝেতে। মাথা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। পাশে উল্টে পড়ে আছে চেয়ার। তাড়াতাড়ি স্যাভলন ও তুলো নিয়ে এল শুক্তি। মুছিয়ে দিল রক্ত। 'কীভাবে পড়লে? তোমাকে মানা করছি না চেয়ারের উপর উঠতে?' ঝাঁঝাল গলায় বলল সে।

'আমি উঠিনি।' ফুঁপিয়ে কাঁদছে সুপ্তা।

'ওঠোনি তা হলে পড়লে কী করে?'

'আমাকে ধাক্কা দিল।'

'কে ধাক্কা দিল?'

জবাব দিল না সুপ্তা।

'বলো কে ধাক্কা দিল?' এবার রেগে গেল শুক্তি।

'জানি না।'

ঠাস করে মেয়ের গালে চড় মারল শুক্তি। 'শুধু মিথ্যা কথা, না?'

সুপ্তা তাকাল মার দিকে। আশ্চর্য! চড় খেয়েও কাঁদল না মেয়েটা! শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে মার দিকে।

শুক্তি জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। 'আমার মা-মণি।' মেয়ের গালে গাল চাপল সে। 'কেন মিথ্যে বললে আমার সাথে বলো তো?'

একটা কথাও বলল না সুপ্তা। হঠাৎ মাকে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও। অবাক হলো শুক্তি মেয়ের ব্যবহারে। সুপ্তা হেঁটে যাচ্ছে। বারান্দার রেলিং ধরে বাইরে তাকাল।

'নিশ্চয় অভিমান করেছে আমার উপর,' ভাবল শুক্তি। এগিয়ে গিয়ে ধরতে চাইল মেয়েকে।

'না,' যেন ফোঁস করে উঠল সুপ্তা। 'আমাকে ছোঁবে না তুমি।' ভ্রূ কুঁচকে তাকাল শুক্তি। এমন বদলে যাচ্ছে কেন মেয়েটা?

'মা-মণি, আমি মাফ চাইছি তোমার কাছে। আর মারব না তোমাকে।'

সুপ্তা তাকাল মায়ের দিকে। শিউরে উঠল শুক্তি। একি তার মেয়ে! ভাবল সে। এমন শীতল চাউনি!

'হরর বই পড়ে পড়ে তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। এখন যত আজগুবি চিন্তা,' রাতে বিছানায় শুয়ে বল্লল আবরার। শুক্তি ইতিমধ্যে সব খুলে বলেছে স্বামীকে।

'শুধু শুধু মারলে মেয়েটাকে। মোখলেস সাহেব তোমার মাথায় উদ্ভট চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন,' আবরার বলে চলল। 'চেয়ারের উপর উঠেছিল। চেয়ার নিয়ে পড়ে গেছে। কে ধাক্কা মারবে, শুনি? যত্তো সব। লক্ষ্মী মেয়ে আমার কী সুন্দর ঘুমোচ্ছে। এতটুকু মেয়ের গায়ে হাত দিলে তুমি?'

'মিথ্যে বলল কেন তা হলে?'

'তোমার সাথে মজা করতে পারবে না সে?' আবরার হাত বাড়িয়ে শুক্তিকে কাছে টেনে নিল।

ঘুম আসছে না শুক্তির। সারা শরীরে স্বামীর আদরের ছোঁয়া।

গভীর তৃপ্তিতে ঘুমোচ্ছে আবরার। আকাশে মেঘের গর্জন কানে এল। বাতাস বইছে। ঝড় উঠছে। 'আমার আসলে ফ্রিজিয়াম খাওয়া উচিত।' ভাবল সে। 'অতিরিক্ত টেনশান করছি আমি। কিছুদিন ফ্রিজিয়াম খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।' হঠাৎ খসখস শব্দে কান খাড়া করল ও। সুপ্তার দিক থেকেই শব্দটা আসছে। নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষা করছে শুক্তি। সুপ্তা নিঃশব্দে ওকে ডিঙাল। ডিঙাল আবরারকে। তারপর নেমে পড়ল খাট থেকে। ভেজানো দরজা নিঃশব্দে খুলল। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় শুক্তি দেখল দরজা খুলে বারান্দায় গেল সুপ্তা। খাট থেকে শুক্তিও নামল। নিঃশব্দে অনুসরণ করল মেয়েকে। চোরের মত পা টিপে টিপে হাঁটছে সুপ্তা। বাইরে অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানি। যেন অদৃশ্য ইশারায় হেঁটে যাচ্ছে সুপ্তা। হ্যাঁ, যাচ্ছে ওই কোণার ঘরটার দিকে। তালাবন্ধ। ছিটকিনি আঁটা। দেখা যাক কীভাবে তা খোলে! ভাবল শুক্তি। সুপ্তা দাঁড়াল বন্ধ দরজার সামনে। এক মুহূর্ত কী ভাবল। ফিরে তাকাল পিছনে। ঠিক ওই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এবং একই সাথে চমকে উঠল শুক্তি। তার কণ্ঠ

থেকে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার। মেয়েটি সুপ্তা নয়। সুপ্তার বয়সী। পোড়া বিদগ্ধ মুখ। বীভৎস দেখতে। হাসল মেয়েটি। ঝলসানো বিকৃত মুখে হাসিটি ভয়ঙ্কর দেখাল। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল শুক্তির দিকে। দু'পাটি দাঁত বিশ্রী অবস্থায় বেরিয়ে আছে মেয়েটির। ধক ধক করে জ্বলছে তার চোখ দুটো। কিছুটা দূর থেকেও তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেল শুক্তি।

'না!' আবার চিৎকার দিল শুক্তি। 'এগোবে না তুমি!'

জিভ বেরিয়ে এসেছে মেয়েটির। শিউরে উঠল শুক্তি। কালো, অর্ধেক খসে যাওয়া জিভ। লালা ঝরছে।

'না!' শুক্তি বারান্দার পাশ থেকে ফুলের টবটা গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতে ধরে ছুড়ে মারল।

ঘুম ভেঙে গেল আবরারের। শুক্তির চিৎকার শুনতে পেয়েছে সে। দ্রুত বিছানা থেকে নামল। দৌড়ে চলে এল বারান্দায়। দেখে বারান্দার মাথায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে শুক্তি। আবরার দৌড়ে এসে ধরল তাকে।

'কী হয়েছে?' শুক্তিকে ধরে ঝাঁকি দিল আবরার।

'তিতলি!' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল শুক্তি। যেন এ জগতে নেই ও।

'তিতলি! কীসের তিতলি?' আবরার পুনরায় ঝাঁকি দিল শুক্তিকে।

'আমি দেখেছি ওকে।...হ্যাঁ, মেয়েটাকে আমি দেখেছি!' খিলখিল করে হেসে উঠল শুক্তি। 'এই মেয়েটি আগুনে পুড়ে মরেছিল। আমার মেয়েও এভাবে মরবে এ বাড়িতে।'

আবরার ঠাস করে চড় কষল শুক্তির গালে। ঢলে পড়ল শুক্তি। ওকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে শোয়াল আবরার। মোমবাতি জ্বালল। ঝড়ো বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে মোমবাতির আলো। একই সাথে কেঁপে উঠছে দেয়ালে প্রতিফলিত হওয়া আবরারের ছায়া। বাকি রাতটুকু স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল সে।

সকালে মোখলেস সাহেব এসে অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখলেন। গাড়িতে মালপত্র তুলছে আবরার ও শুক্তি। লালটুকটুকে ফ্রক পরে আনন্দে দৌড়াদৌড়ি করছে সুপ্তা। 'সত্যিই চলে যাচ্ছ তোমরা?' স্নেহ ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠ থেকে।

'হ্যাঁ, চাচা। এ বাড়িতে আর থাকতে চাই না। তবে মনে রাখব আপনাকে।' শুক্তি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। 'ঢাকায় গেলে অবশ্যই বেড়াতে আসবেন।'

'আসব, মা।' শুক্তির মাথায় হাত বোলালেন বৃদ্ধ ডাক্তার। এই পরিবারটিকে তাঁর ভাল লেগেছিল খুব।

ওদের গাড়ি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলেন সেদিকে। তারপর তাকালেন বাড়িটির দিকে। চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল তাঁর। মনে পড়ল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে তিনি যখন এ বাড়িটি কিনেছিলেন, তার ছয় বছরের ছোট্ট

মেয়ে তিতলি পাখির মত কিচিরমিচিরে মুখরিত করে তুলত পরিবেশটা। তাকে বাঁচাতে পারেননি মোখলেস সাহেব। শহর থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাঁর। বুঝতে পারেননি তাঁর স্ত্রী শয়তানের উপাসনা করত। নিজের মেয়েকে শয়তানের নামে উৎসর্গ করতে বুক কাঁপেনি ডাইনীটার। তবে সান্ত্বনা এই যে ডাইনীটাকে শেষ পর্যন্ত খুন করেছিলেন তিনি। কেউ জানে না। তিতলির আত্মা কি শান্তি পেয়েছে তাতে? জানেন না তিনি। এ বাড়িতে যে-ই ওঠে সে-ই সম্ভবত বিদগ্ধ তিতলিকে দেখে। ভয় পায় তারা। ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তিতলি কখনও দেখা দেয়নি মোখলেস সাহেবকে। নিজের মেয়েকে দেখতে হঠাৎ করে বড় সাধ হয় তাঁর। বাড়িটা আবার কিনবেন, মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন। বাকি জীবন মেয়ের কাছাকাছিই থাকতে চান।

মিজানুর রহমান কল্লোল

রাতের আতঙ্ক

এ কাহিনী জানতে পেরেছিলাম এক অচেনা রহস্যময় বুড়ো লোকের কাছ থেকে। আজ থেকে দুই বছর আগে আমি তখন ট্রেনে করে চুয়াডাঙ্গা থেকে রাজশাহী যাচ্ছি। ট্রেনে সেই লোকটার সাথে আমার পরিচয় ঘটে। কালো মুখের উপর ঘন সাদা গোঁফ ও দুই গালের উপর খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি এবং তেল চকচকে টাক মাথা বুড়ো লোকটাকে বিচিত্র চেহারা দান করেছিল।

আমি ট্রেনে উঠে একটি জানালার ধারে বসে ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ট্রেন ছাড়ল। দেখলাম, ট্রেনের কামরায় আমি ছাড়া কেউ নেই। জনবহুল দেশের একটি ব্যস্ততম রেলপথে ট্রেনের কামরাতে এমন যাত্রী খরা দেখে একটু অবাকই হলাম। বেশি না ভেবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। খানিক পরে ছোট একটি কাশির শব্দ শুনে পাশে তাকিয়ে দেখি, সেই বুড়ো লোকটা আমার খুব কাছেই বসে আছে। অবাক হলাম ভেবে–পুরো খালি কামরাটায় এতগুলো সিট খালি থাকতে লোকটা একদম আমার পাশেই এসে বসল কেন? আমি একটু সতর্ক হলাম আর মানিব্যাগটার উপর আরেকটু চাপ দিয়ে বসলাম। কিছু সময় এভাবে যাওয়ার পর লোকটি বলল, 'শুধু শুধু এভাবে চুপচাপ যাওয়ার চেয়ে আমি একটি গল্প বলব, শুনবেন?'

লোকটার এরকম হঠাৎ প্রস্তাবে একটু অবাক হলেও যেহেতু আমি গল্পের ভক্ত, সেহেতু বললাম, 'গল্প বলবেন ভাল, তা বলেন।'

লোকটি বলল, 'তবে গল্প বলা শেষ হলে দয়া করে আমাকে দশটা টাকা দেবেন।'

অবাক হলাম।

লোকটা বলল, 'মানসিক সমস্যায় চাকরি হারিয়েছি। টাকার বড় টানাটানি। সারাদিন কিছু খাইনি, তাই দশটা টাকা চাইলাম।'

আমি ভাবলাম, রাস্তাঘাটে তো ফকির-মিসকিনকে দুই-এক টাকা দিতে দিতে প্রায় দিনই পাঁচ-ছয় টাকা যায়, একটা গল্প শুনে দশ টাকা দেব এ আবার এমনকী। বললাম, 'ঠিক আছে, দেব। আপনি গল্প বলা আরম্ভ করেন।'

যদিও লোকটি বুড়ো, তবে স্পষ্ট গলায় সে গল্প বলা শুরু করল। 'ঘটনাটি আজ থেকে কয়েক বছর আগের। যাদবপুর নামের একটি ছোট শহরে একটি ছোট পরিবার ছিল। পরিবারটিতে ছিল একটি একুশ বছরের মেয়ে ও তার বাবা-মা। বাবা ছিল একটি সরকারি অফিসের পিয়ন আর মেয়েটি লেখাপড়া বাদ দিয়ে ঘরে বসে মায়ের সাথে সেলাইয়ের কাজ করত। বাবার চাকরির বেতন ও সেলাই থেকে সামান্য আয় সংসারে সচ্ছলতা না দিলেও তিনবেলা পেটের আহার ও টুকটাক খরচের যোগান কোনমতে দিত। মেয়েটি ছিল মোটামুটি সুন্দরী। আমাদের সমাজে যা ঘটে আর কী, অর্থাৎ সেই মেয়েটির উপর এলাকার ধনী চেয়ারম্যানের ছেলে, যে নিজ এলাকায় বড় ভাই নামে পরিচিত, তার কুনজর পড়ে গেল। বড় ভাইয়ের বিশ্রী প্রস্তাবে রাজি না হলে, মেয়েটির উপর নেমে আসে মহা দুর্ভাগ্য। বড় ভাই ও তার এক বন্ধু মিলে মেয়েটিকে রাস্তা থেকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যেয়ে যাদবপুর শহর থেকে একটু দূরে তার ওই বন্ধুর এক খালি গুদামে আটকে রেখে দু'জন মিলে মেয়েটিকে নিয়ে পাশবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করে।'

এইটুকু বলে বুড়ো লোকটা একটু থামলে আমি তাকে বললাম, 'তা হলে এটাই আপনার গল্প?'

লোকটা বলল, 'না, গল্প আসলে এটা না, গল্প এর পরেরটুকু, কিন্তু আমি ভাবছি আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা।'

'বিশ্বাস না করার কী আছে, আপনি যদি বাস্তব গল্প বলেন তা হলে বিশ্বাস করব, আর যদি কাল্পনিক গল্প বলেন তা হলে অবিশ্বাস করব।'

'আসলে এই গল্পটি বাস্তব, কিন্তু পরের অংশটুকুতে অলৌকিকত্বের ছাপ আছে।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি বলা শুরু করেন।'

লোকটি শুরু করল, 'সেই বড় ভাই আর বন্ধুটি তাদের সম্ভোগ পূর্ণ করে মধ্যরাত্রে চলে গেলে মেয়েটি তার দেহটি খুব কষ্টে উঠিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া জামার উপর ওড়নাটা পেঁচিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে হেঁটে চলল সোজাসুজি বড় ভাইয়ের বাড়ির দিকে, অর্থাৎ এলাকার ধনাঢ্য চেয়ারম্যান-বাড়ির দিকে। মেয়েটি চেয়ারম্যান বাড়ির সামনে যেয়ে জোরে জোরে ডাকতে লাগল, "চেয়ারম্যান সাহেব! চেয়ারম্যান সাহেব!!"

'মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে একটি মেয়ের এরকম চিৎকার শুনে চেয়ারম্যান খুবই

অবাক হয়ে গেল। আরও দু-তিনবার চিৎকার শুনে চেয়ারম্যান নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল এবং জিজ্ঞেস করল, "এই মাঝরাতে কী হলো?"

'মেয়েটি চিৎকার করে বলল, "আপনার বড় ছেলে আমার সর্বনাশ করেছে। আমি এর উচিত বিচার চাই।"

'চেয়ারম্যান তার নালিশ শুনে, থানায় গেলে লাভ হবে না সেটা জেনেও অবজ্ঞাভরে বলল, "আমার ছেলে যদি তোমার ক্ষতি করেই থাকে তা হলে থানায় গেলেই পারতে, আমার এখানে এসেছ কেন?"

'মেয়েটি কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলল, "আপনি তার বাবা, এখানকার চেয়ারম্যান; আপনার কাছে যাব না তো কোথায় যাব?"

'চেয়ারম্যান বিরক্তি সহকারে বলল, "ঠিক আছে, কয়েক হাজার টাকা দিচ্ছি, তা দিয়ে চিকিৎসা করিয়ো আর বাকি টাকা দিয়ে যা ইচ্ছা তাই কোরো।"

'মেয়েটি এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "চেয়ারম্যান সাহেব! আমার মতো গরীব মেয়ের দুর্ভাগ্যের বিচার করবেন না? এর একটা উচিত বিচার না করলে আমি সারা এলাকাবাসীর কাছে আপনার বড়ছেলে আর আপনার তাচ্ছিল্যের কথা বলে দেব। জানি এতে আপনাদের হয়তো কোন ক্ষতিই হবে না, তবুও আপনাদের প্রকৃত চেহারাটা অন্তত সবার কাছে প্রকাশ করতে পারব…" এ পর্যন্তই মেয়েটি সম্ভবত বলতে পেরেছিল। ওই রাতের শেষেই ফজরের নামাজের পর ফেরার পথে কয়েকজন মুসল্লি একটি পুকুরের ধারে মেয়েটির রক্তাক্ত লাশ দেখতে পায়।

'মেয়েটির মৃত্যুর প্রায় এক মাস পরের ঘটনা। চেয়ারম্যান বাড়ির সবাই রাতের খাওয়া সেরে ঘুমাতে গেল। কিছুক্ষণ পর সেই বড় ভাইয়ের ঘর থেকে তীব্র চিৎকার ভেসে এল। চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রীসহ অন্য দুই ছেলেমেয়ে ছুটে গেল তার ঘরে। তারা যেয়ে দেখে সে মেঝেতে পড়ে থরথর করে কাঁপছে। চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

'বড় ভাই অনেক সময় নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল, "বিছানায় শোয়ার কিছুক্ষণ পর দেখি উপরের সিলিং ফ্যানের পিছন থেকে মানুষের মত একটি কালো ছায়া আস্তে আস্তে সিলিং বেয়ে, ঘরের দেয়াল বেয়ে নীচে নেমে এল। ছায়াটি স্থির হয়ে থাকল। তারপর কোথা থেকে যেন একটি মৃদু মেয়েলি কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কান্নার শব্দ থামতে না থামতেই ছায়াটি ঝড়ের বেগে আমার মুখের উপর এসে ভাসতে লাগল। আমি চিৎকার দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পালাতে যেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম। উঠতে গিয়ে দেখি শরীরে একটুও শক্তি পাচ্ছি না।"

'বাড়ির সবাই তার কথা শুনে অবাক হয়ে আশেপাশে তাকাতে লাগল, কিন্তু কোথাও ওই ধরনের কোন ছায়া দেখল না। সে ভুল দেখেছে না সত্যি দেখেছে সে সম্বন্ধে কেউ নিশ্চিত হতে পারল না। এরইমধ্যে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ শরীরের শক্তি ফিরে পেয়েছে। তাকে সবাই এটা-ওটা বলে আশ্বস্ত করল। বাড়ির স্বাস্থ্যবান চাকরকে চেয়ারম্যান বলল তার বড়ছেলের ঘরে শুতে, যাতে সে ভয় না

পায়। রাত পার হলো। পরের দিন সকালে চাকর বড়ছেলের বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে, সে নেই। তার বদলে বিছানার চাদরের উপর লাল রক্তের ছোপ-ছোপ দাগ। চাকরটি ছুটে যেয়ে সবাইকে তা জানাতেই চেয়ারম্যান-বাড়িসহ গোটা এলাকাতেই চেয়ারম্যানের বড় ছেলেকে খোঁজার জন্য মহা হুলস্থুল পড়ে গেল। এদিকে একই দিন সকাল থেকে বড় ভাইটির সেই বন্ধুটিও নিখোঁজ। সুতরাং তাকেও সমান তালে খোঁজা আরম্ভ হলো। প্রায় দুদিন এভাবে খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে চেয়ারম্যানের ছেলের মৃতদেহ মিলল সেই গুদাম ঘরে। গুদাম ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল চেয়ারম্যানের ছেলের রক্তাক্ত উলঙ্গ লাশ একটি বস্তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তবে সেই বন্ধুটিকে গুদাম ঘরে বা তার আশেপাশে কোথাও পাওয়া গেল না। এর মাত্র একদিন পরের ঘটনা। যে মুসল্লিরা একটি পুকুরের ধারে মেয়েটির লাশ দেখতে পেয়েছিল, সেই একই মুসল্লিরা সেই পুকুরেরই সেই একই স্থানে দেখতে পেল জমা করে রাখা শুকনো কচুরিপানার স্তূপের ভিতর থেকে একটি মানুষের হাত বেরিয়ে রয়েছে। সেদিনই পাওয়া গেল সেই বন্ধুটিকে, অর্থাৎ আরেকটি রক্তমাখা উলঙ্গ লাশ। দুটি লাশ পাওয়ার পর এলাকাবাসীর কাছে একটি ব্যাপার দুর্বোধ্য রহস্যের সৃষ্টি করল, কারণ চেয়ারম্যানের ছেলের লাশের গলায় পেঁচানো একটি ওড়না পাওয়া গিয়েছিল আর তার বন্ধুর লাশের মুখের ভিতর গোঁজা অবস্থায় একটি জামা পাওয়া গিয়েছিল। সেই ওড়না আর জামা মরে যাওয়া মেয়েটির গায়ে পরা ছিল! এ দুটো ঘটনার মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর একদিন রাতের খাবার খেয়ে চেয়ারম্যান সাহেব ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় শুনতে পেল বাড়ির বাইরে উঠানে কোন মেয়ে মৃদু শব্দ করে কাঁদছে। তার একটু ভয় লাগল, তবুও সে একাই সাহস করে হাতে তার বন্দুকটি নিয়ে বাইরের বারান্দায় এল।

'বাইরে আসার খানিক পরেই সে একটি তীব্র চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে বারান্দার উপর পড়ে গেল। বাড়ির লোকেরা বাইরে ছুটে এল এবং তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। তার জ্ঞান ফিরে এলে যখন সবাই জিজ্ঞেস করল কী হয়েছিল তখন সে আর কিছুই বলতে পারল না। পরবর্তীতে সে আর কোন-দিনই মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারল না। শুধু খাওয়া-দাওয়া ও হাঁটাচলা করতে পারত।'

বুড়ো লোকটি গল্প বলা শেষ করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ গল্প আপনি জানলেন কী করে?'

খানিক চুপ করে থাকল বুড়ো, ছলছল করে উঠল চোখ। বাষ্পরুদ্ধ অস্ফুট স্বরে শুধু বলল, 'আমিই মেয়েটির বাবা।'

আব্বাস তুলন

হাসপাতাল

ডেরেকের গল্প...

ধীরেসুস্থে গাড়ি চালাচ্ছি। মার্চের ঠাণ্ডা, সূর্যালোকিত একটি দিন। গাছের ডালে আর ঝোপ-ঝাড়ে ফুটেছে সবুজ কুঁড়ি।

চমৎকার একটি দিন।

আমার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। আরেকটা বছর কাজ করতে হবে...তারপর, দুনিয়া চলে আসবে আমার হাতের মুঠোয়। ম্যাপে চোখ বুলালাম। প্রথম যাকে চোখে পড়ল, গাড়ি টেনে নিয়ে গেলাম তার পাশে।

'হাসপাতাল? এই তো কাছেই। প্রথমে ডানে মোড় নেবেন, তারপর সোজা যাবেন।'

সেন্ট স্টিফেন্স হাসপাতাল পুরানো একটা দালান, গাঢ় ধূসর পাথরের। সম্ভবত আঠারোশো সালের মাঝামাঝি তৈরি করা হয়েছে। প্যারাপেটসহ ভিক্টোরিয়ান ইমারতগুলোতে কল্পনার ছোঁয়া আছে।

তবে আমার তেমন পছন্দ হলো না। চারশো বেডের হাসপাতাল, প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জায়গা, লন্ডন থেকে মাত্র দেড়ঘণ্টার রাস্তা। সোজা রিসেপশনে চলে এলাম।

'হার্টলি? ডেরেক হার্টলি? আপনি মি. লিয়ার মাস্থের ইউনিটে, ডক্টর। ওয়ার্ড নং ২৮, ২৯, ৩০, ষষ্ঠতলা। হেঁটেই যাওয়া যায়, লিফটও নিতে পারেন।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় লক্ষ করলাম ওয়ার্ডগুলো বিখ্যাত সার্জনদের নামে নাম রাখা হয়েছে–ট্রেভেস, ওয়াকলি, হান্টার, ম্যাকুইন, মর্টন, বার্নার্ড।

আমার ওয়ার্ডের নাম 'নাথানিয়েল মর্টন।' ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের। জায়গাটার সাথে যত দ্রুত সম্ভব নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

তিনটে ওয়ার্ড মিলে সার্জিকাল ইউনিট। ২৮ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ড পুরুষদের। আমি ২৮ নং ওয়ার্ডের হাউস-সার্জন; ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের করিডর আমাদের সোজাসুজি, সিঁড়ির অপর পাশে। ৩০ নম্বর ওয়ার্ড মহিলাদের, লম্বা একটা করিডর ডান দিক ঘেঁষে আমাদেরকে ছুঁয়ে গেছে।

আমি দ্রুত সব গুছিয়ে নিলাম।

ওয়ার্ডটা লম্বা, ঝকঝকে, ফুলদানিতে ফুলও আছে। করিডরের বাইরে সাধারণ কিছু কামরা–সিস্টারদের রুম, রান্নাঘর, লিনেন রুম, স্টেরিলাইজিং ও ডিউটি রুম।

হাসপাতালে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে গেলাম। হাসপাতালে হার্টের অসুখ, আগুনে

পোড়া রোগী, কিডনির পেশেন্ট ইত্যাদি সবার জন্য আলাদা ওয়ার্ড। আমরা সাধারণ অপারেশনগুলো করছি–হাড় ভাঙা, গাড়ি দুর্ঘটনা, অ্যাপেন্ডিস, গলব্লাডার ইত্যাদি।

হপ্তাখানেকের আগে লম্বা করিডর ধরে হেঁটে বেড়ানোর ফুরসত মিলল না। এ করিডর চলে গেছে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সমস্ত জায়গা নীরব। করিডরে কেউ নেই, কামরাগুলো খালি, দরজা বন্ধ, বাতি নেভানো। শুধু একটি ছাড়া।

করিডরের মাঝামাঝিতে, দরজার উপরে, ভেন্টিলেটারের মত একটি জানালা দিয়ে আলো আসছে। অদ্ভুত একটা আলো, অন্তত আমার কাছে তা-ই মনে হলো। হাসপাতালের বাতির আলোর মত নয়, অনেক বেশি হলুদ এবং নরম।

পা বাড়ালাম ওদিকে, এবং তারপর···হা ঈশ্বর। না, এটা আশা করিনি আমি।

গায়ে কাঁপুনি উঠে গেছে আমার, টের পাচ্ছি, পা জোড়া ভয়ানক দুর্বল লাগছে। এখান থেকে চলে না গেলে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ব আমি।

কয়েক কদম পিছিয়ে এলাম। তবে বমি বমি ভাবটা গেল না। ওই ঘরে যা-ই ঘটুক না কেন, খুব, খুব খারাপ কিছুই হবে। মানুষ এবং জায়গার ব্যাপারে আমার এই অস্বাভাবিক সংবেদনশীল ব্যাপারটা সবসময়ই ঘটে। আমি জানি না এটা কী কিংবা কীভাবে আমার মধ্যে চলে এল।

'অলৌকিক যে কোন কিছু আপনি টের পান বা বুঝতে পারেন,' একবার এক স্পিরিচুয়ালিস্ট বলেছিলেন আমাকে।

বছর চারেক আগে আমি ভাড়া নেওয়ার জন্য ফ্ল্যাটবাড়ি খুঁজছিলাম। বাড়িটির একটি ঘরে ঢুকতেই পারিনি, এমনই অস্বস্তি লাগছিল। বাড়ির এজেন্ট বলল ওই ঘরে মাতাল হয়ে ঝগড়া করার সময় এক লোক তার স্ত্রীকে খুন করে ফেলে।

তারও কয়েক বছর আগে, ছুটি কাটাতে গেছিলাম ডার্বিশায়ারে, একদল ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্কিওলোজিস্টের সঙ্গে। এক জায়গায় গিয়ে ঠিক একই রকম অনুভূতি হচ্ছিল আমার। অথচ ওখানে এমনটি হওয়ার কথা নয়। পরে শুনেছি এক লোক তার গার্লফ্রেন্ডকে খুন করেছিল, তারকাঁটার বেড়া বেয়ে উঠে লাশটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় একটা খনিতে। ওই খনি দেখতে গিয়েছিলাম আমরা।

আর এবার এটা···

নিজেকে চোখ রাঙালাম। দুরো, আমি নিশ্চয় কল্পনা করছিলাম। তাকালাম দরজার দিকে।

ভারী কাঠের, পুরানো আমলের দরজা।

কদম বাড়ালাম, হাতল ধরে মোচড় দিলাম।

বন্ধ।

করিডরে পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়ালাম। ৩০ নাম্বার ওয়ার্ডের ছোটখাট ওয়েলশ নার্সটি।

'কী হয়েছে, ডেরেক? আপনাকে এমন লাগছে কেন! যেন ভূত দেখেছেন।'

'ওই আলোটা,' বললাম আমি। 'ওটা কী?'

চোখ বড়বড় করে তাকাল সে। 'কীসের আলো?'

'ওই যে,' আঙুল তুলে দেখালাম। 'দরজার ওপরে।'

উপরে মুখ তুলল সে, কপালে ভাঁজ। 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমরা। সেই ঠাণ্ডা, শিরশিরে অনুভূতিটা ফিরে এল আবার। 'বেশ...আমি... এখানে এসো। আমি যেখানটাতে দাঁড়িয়ে আছি।'

মেয়েটি তাই করল। 'ওই কামরায় কোন আলো জ্বলছে না,' বলল সে। হাতল ধরে টানাটানি করল। 'দরজাও তো বন্ধ দেখছি।'

বিড়বিড় করে বললাম সম্ভবত আমারই দেখার ভুল হয়েছে। নার্স আমার ওয়ার্ডের দিকে হেঁটে গেল।

করিডর ধরে কয়েক পা এগোলাম, তাকালাম পিছন ফিরে। আবার জ্বলছে আলোটা।

পরদিন সকালে ওয়ার্ড সিস্টারদের সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম। 'করিডরের ওই ঘরটা কীসের?'

'কোন্ ঘরের কথা বলছেন?'

'৩০ নাম্বার ওয়ার্ডে যেতে পড়ে।'

'ওহ্, ওইটা।' সিস্টারকে বিব্রত দেখাল। 'ওই ঘরটা কেউ ব্যবহার করে না। স্পেয়ার রুম।'

'স্পেয়ার রুম!' বললাম আমি। 'অথচ আমরা বাড়তি ঘরের জন্য চিল্লাচিল্লি করছি।'

'ঘরটা খালি।' অর্থপূর্ণভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। 'আপনি তো জানেনেই এরকম ঘর কেন খালি থাকে...কোন কিছুই এসব ঘরে ঠিক মানায় না, মানে মানানো যায় না। স্টোর রুম হিসেবে ঘরটা ব্যবহার করার চেষ্টাও করা হয়েছিল। কাজ হয়নি।' এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল সে। 'ইতিহাস ঘাঁটলে ওই ঘর সম্পর্কে হয়তো নানা কিছু জানতে পারবেন আপনি। যদ্দূর জানি ওই ঘর ব্যবহার করতেন নাথানিয়েল মর্টন।'

'কে?'

হেসে উঠল মেয়েটা। 'মর্টন। যার নামে এ ওয়ার্ডের নাম।'

আবাসিক ডাক্তারদের জন্য একটি কমন লাউঞ্জ আছে। সুসজ্জিত, আরামদায়ক এ লাউঞ্জে ভাল একটি লাইব্রেরিও আছে। আমি লাইব্রেরির রেফারেন্স বিভাগে ঢুকলাম।

ভাগ্য ভালই বলতে হবে। পেয়ে গেলাম হায়ামসনের 'ডিকশনারী অভ ইউনিভার্সাল বায়োগ্রাফি।'

আমি নাথানিয়েল মর্টনের নাম খুঁজে বের করলাম। ওতে লেখা ইংল্যান্ড,

সার্জন, ১৮৩৭-১৮৭১। ব্যস, এটুকুই।

পাশে পাদটীকায় নির্দেশ করা এ বিষয় বিস্তারিত পাওয়া যাবে কনসাইজ ডিকশনারী অভ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফিতে।

খুঁজে দেখতে সময়ের দরকার। কারণ যেতে হবে স্থানীয় লাইব্রেরিতে। আমি পাতাটায় আবার চোখ বুলালাম। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মারা যান মর্টন। কিন্তু কী ঘটেছিল?

'কী খুঁজছেন, ডেরেক?' প্রশ্ন করল একজন।

বললাম তাকে।

'মর্টন? আপনার চিফকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?'

আমি আসলে একটা আহাম্মক! চিফের কাছে গেলেই হত। আমার চিফ ভাল মানুষ। অন্তত এ পর্যন্ত যে ক'জনের সাথে কাজ করেছি তাদের মধ্যে চিফকেই সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে।

এগারোটার দিকে, ওয়ার্ডে রাউন্ড শেষ করে চিফের ঘরে গেলাম। কফি আর বিস্কিট দিয়ে আপ্যায়িত করলেন তিনি। একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

'ভেবেছি আপনি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন, সার,' বললাম আমি।

দরাজ গলায় হাসলেন তিনি। 'সিগারেটের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। পরিমিতভাবে ধূমপানে ক্ষতি নেই।'

কিছুক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে গল্প করার পর বললাম, 'একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম…'

'কী?'

'এই ওয়ার্ড সম্পর্কে। নাথানিয়েল মর্টন কে?'

'অঃ… আচ্ছা…' এক মুহূর্ত নীরবতা। 'এ বিষয়টি নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই।' ডেস্কের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'এক মিনিট, আমার মনে হয় হাসপাতালের ইতিহাসের ওপরে…হ্যাঁ, এই তো পেয়ে গেছি।'

আমার হাতে বইটি দিলেন তিনি।

একটা গ্রুপ ছবি।

অপারেটিং গাউন গায়ে এক সার্জন তাকিয়ে আছে আমার দিকে; বাম হাত দিয়ে মুঠো করে ধরা ডান হাত। ওই হাতে একটি স্ক্যালপেল।

সার্জনের পাশে আরেক লোক। ছয়জন নার্স।

তবে দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সার্জন।

লোকটা লম্বা, পাঁশুটে চেহারা, কঠিন চোয়াল, নীরস অভিব্যক্তি। তবে নজর কেড়ে নিল চোখ জোড়া। ওই চোখ! ছবির মধ্যেও চোখের সম্মোহন শক্তি টের পাওয়া যায়। 'ইনিই তা হলে সেই ব্যক্তি?'

'হ্যাঁ।' চিফ ইশারায় বইটা আমাকে রেখে দিতে বললেন।

'আমি একটু আগেই তোমাকে পরিমিতি বোধের কথা বলছিলাম।

মর্টনের মধ্যে এ ব্যাপারটা ছিল না। খুবই প্রতিভাবান সার্জন ছিলেন। দুর্দান্ত প্রতিভাদীপ্ত। মারা যান ১৮৭১-এ।'

'জানি আমি।'

'মানুষের হার্ট নিয়ে তাঁর কাজ কারবার ছিল। এ বিষয়ে মর্টন ছিলেন বিশেষজ্ঞ। এমন কিছু কৌশল তিনি আবিষ্কার করে গেছেন যা আজও হার্ট অপারেশনে লাগে। জানতেন তিনি ভাল কাজ জানেন, টের পেতেন আরও বিরাট কিছু করার সীমানায় পৌঁছে গেছেন। তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর,' শ্রাগ করলেন চিফ, 'ওটা অবসেশনে পরিণত হয়। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যা খুশি করার অধিকার তাঁর আছে।'

'কিন্তু তিনি করছিলেনটা কী?'

'হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। '১৮৭১ সালে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন চিফ। 'ওই সময় এ বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসকরা চিন্তাভাবনা করছিলেন। তবে তত্ত্বটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। মর্টনের কাছে কোন যন্ত্রপাতি ছিল না, ছিল না রক্ত সঞ্চালন করার কোন জিনিস, ড্রিপ, জানতেন না জীবাণু নিরোধক কোন কৌশল। তা ছাড়া তাঁর সমস্ত আইডিয়াই ছিল ভুল। সোজা ভাষায়, হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের নামে ওটা ছিল খুন।'

'কিন্তু...মর্টন কী করছেন তা জানতেন না কেউ?'

'তাঁর কর্মচারীরা জানত। তবে তাদের ধারণা ছিল মর্টন মহা যুগান্তকারী এক আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাই তারা মুখ বন্ধ করে রাখত। অবশ্য নিজের ওয়ার্ডে মর্টনই ছিলেন হর্তা-কর্তা-বিধাতা।'

আমার বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। 'কিন্তু মর্টনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ? ওঁরা নিশ্চয় জানতেন ব্যাপারটা?'

'তাঁরা জানতেন মর্টন হার্ট অপারেশন করছেন, টের পাননি তিনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের চেষ্টা করছেন।' সিগারেটে টান দিলেন চিফ। 'অবশেষে গুজব ছড়াতে শুরু করে, পুলিশ ঘেরাও করে ফেলে হাসপাতাল; ঠিক ওই সময় মর্টন একটা অপারেশন শুরু করেছেন।'

'তারপর?'

'মর্টন রাগে এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠেন, মেরে ফেলেন রোগীকে। হত্যার অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে, ঝুলিয়ে দেয়া হয় ফাঁসিতে।'

'অদ্ভুত,' বিড়বিড় করলাম আমি। 'উনি পাগল ছিলেন?'

'না,' বললেন চিফ। 'বেপরোয়া ছিলেন তিনি।' অ্যাশট্রেতে সিগারেট চেপে নিভিয়ে ফেললেন আগুন। চলে যাওয়ার জন্য সিধে হলাম দু'জনে। 'এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতেন মর্টন,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'করিডরে, ভেন্টিলেটরসহ ঘরটা তো দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'ওখানে তিনি অপারেশন চালাতেন।'

আমি জানতাম, উল্লসিত হয়ে ভাবলাম, জানতাম ওই ঘরে কোন ভজকট আছে।

আর ঘরটিতে নানা অদ্ভুত কাণ্ড চলল কয়েক মাস ধরে।

হপ্তায় দু'তিনরাত ওই ঘরে আলো জ্বলে। আমি দরজায় কান পাতি। কোন কণ্ঠ শুনতে পাই না, শুধু ট্রলি টানার ঘড়ঘড় আওয়াজ কিংবা বাটিতে যন্ত্রপাতি রাখার ঠুংঠাং শব্দ ভেসে আসে কানে।

তবে বেশিক্ষণ শোনার সাহস হয় না। ইতিমধ্যে আমাকে নিয়ে নানাজনে নানা কথা বলা শুরু করেছে। তাদের ধারণা, আমি উন্মাদ হতে চলেছি।

এ সময় একজন নতুন হাউজম্যান পেলাম আমরা।

আমরা নাজিরকে বিদায় সম্বর্ধনা দিচ্ছিলাম। সে পাকিস্তানে, নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। আমার সাথে পরিচয় হলো নতুন হাউজম্যানের।

সে জাতিতে কেন্ট, ছোটখাট গড়ন, কালো চুল, তারের মত পাকানো শরীর। যেন আমাদের রাগবি দলের জন্য উপযুক্ত খেলোয়াড়।

হাত মেলালাম দু'জনে।

'আংগাস ম্যাকিন্নন,' নিজের পরিচয় দিল সে।

'আমাকে অনুমান করতে দিন,' বললাম আমি। 'আপনি নিশ্চয় থাইল্যান্ডের মানুষ—আর গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছেন?'

হাসল সে। 'স্কাই'র মানুষ আমি। তারপর এডিনবরা চলে যাই।'

'ওখানে রাগবি খেলেছেন কখনও?'

'মাঝে সাঝে।'

'তাতেই চলবে। আর খেলতে গিয়ে যদি পা-টা ভেঙে যায়...'

'তো?'

'তো দর্শক সারিতে প্রচুর ডাক্তার পাবেন।'

নিজের জায়গায় চমৎকার মানিয়ে গেল আংগাস, অনেকেই পছন্দ করে ফেলল ওকে। বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ওর, তবে বেড়ালসুলভ ধূর্ততা এবং সতর্কতাও আছে। ওর মাঝে রহস্যের গন্ধ পাই আমি।

একদিন শুনলাম আবাসিক লাউঞ্জে নাকি ওইজা বোর্ড নিয়ে বসেছিল আংগাস, আত্মা আনবে। জিজ্ঞেস করলে প্রবলভাবে অস্বীকার করে বসল।

অবশ্য কাজের চাপে আমি প্রায় ভুলেই গেলাম ব্যাপারটা।

দৈনিক রুটিন আমাদেরকে ব্যস্ত রাখে সাংঘাতিক। চিফের সঙ্গে রাউন্ডে বেরুতে হয়; এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষা, রোগী কেমন চিকিৎসা পাচ্ছে তা চেক করা, রিপোর্ট লেখা এরকম হাজারটা কাজ থাকে প্রতিদিন।

তারপর, একদিন সন্ধ্যায়, আমরা রাতের খাবারের বিরতিতে ওয়ার্ড ছাড়লাম। করিডর ধরে হাঁটার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ চলে গেল মর্টনের ঘরের দিকে। অন্ধকার।

পা চালিয়ে ঘরটার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, আংগাস হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল. যেন ইটের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে।

আমার হাত খামচে ধরল সে।

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। ওখানে কী?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল সে।

'কেন?'

মুখ সাদা আংগাসের, থরথর করে কাঁপছে।

'জায়গাটা ভাল নয়,' বলল সে, 'টের পাচ্ছি আমি। অশুভ কিছু একটা আছে ঘরটিতে।'

'যাক বাবা, বাঁচলাম!' বললাম আমি।

চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল সে আমার দিকে। 'মানে?'

আমার অনুভূতির কথা জানালাম ওকে। শব্দ, আলোর কথা। আমার সন্দেহ তা হলে অমূলক নয়!

'আর কারও চোখে পড়েনি ব্যাপারটা?'

'না।'

'আপনি নিশ্চয় সাইকিক,' বলল আংগাস। 'ভাল কিংবা মন্দ যা-ই ঘটুক, একটা ভাইব্রেশন বা কম্পনের সৃষ্টি হয়, আর খুব সংবেদনশীল মানুষ ছাড়া অন্য কেউ ব্যাপারটা টের পাবে না। এখানে যা ঘটেছে তা খুবই খারাপ কিছু।'

'অন্য লোকজনও এ জায়গাটা পছন্দ করে না,' বললাম আমি।

'কিন্তু পরিবেশটা দেখছি তোমাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।' বয়স এবং পদমর্যাদা দুটোই আমার চেয়ে নীচে বলে পরিচয়ের ক'দিনের মধ্যে আংগাসের সাথে সম্পর্কটা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামিয়ে এনেছি।

'আমি ওরকমই,' দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল সে। 'লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হাইল্যান্ডারদেরকে নিয়ে মশকরা করে। হাইল্যান্ডাররা বলে তাদের তৃতীয় একটা নয়ন আছে, তা দিয়ে অলৌকিক অনেক কিছু দেখতে পায়। লোকে এ নিয়ে হাসাহাসি করলেও ব্যাপারটা ঠাট্টার বিষয় নয় মোটেই।'

'এ জন্য তুমি ওইজা বোর্ড ব্যবহার করোনি?'

মাথা দোলাল সে। 'আমি অতিপ্রাকৃত শক্তি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। ভয় লাগে।'

'ক্রাইস্ট!' বললাম আমি। 'আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে হাঁপিয়ে গেলাম। আমিও সব সময় ভয়ে থাকি…কী নিয়ে? আমারও সবসময় এরকম একটা অনুভূতি হয়। ভাবি কল্পনা করছি। কিন্তু ঘটনা ঘটে যায়। এবারেরটাও নিশ্চয় আমার কল্পনা নয়?'

তেতো হাসি হাসল আংগাস। 'আপনি কাকে বিশ্বাস করাতে চাইছেন? আমিও একই পথের পথিক। আপনি ঘটনাটা বলার আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে জানতাম না কিছুই।'

'তালা খুলে ভিতরে ঢুকি চলো।' প্রস্তাব দিলাম।

ঘড়ি দেখল আংগাস, মাথা নাড়ল। 'দেরি হয়ে গেছে। এখন না গেলে আর খাবার পাব না।'

'কাল রাতে?'

'যাওয়া যায়।'

এক সাথে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

'চাবি জোগাড় করেছেন?' পরদিন দেখা হলে জানতে চাইল আংগাস।

'হ্যাঁ।'

ও এক ফুট লম্বা, ভারী একটা টর্চ এনেছে কোত্থেকে।

'ভাবলাম এটা কাজে লাগতে পারে,' বলল আংগাস। 'আপনি কিছু আনেননি?'

পকেট থেকে ছোট একটা লাঠি বের করে দেখালাম। পুলিশের বেটন। 'সিকিউরিটি এক্সপ্রেস থেকে ধার করেছি।' দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলাম এক মুহূর্ত, তারপর 'দুত্তোর নিকুচি করি' বলে চাবি ঢুকিয়ে দিলাম তালায়। দরজা ঠেলে ঢুকলাম ভিতরে। আংগাস টর্চের আলো ফেলল।

কিছু নেই।

বড়সড় খালি একটি ঘর, ছাদের বেশিরভাগ দখল করেছে স্কাইলাইট। দেয়ালে সাদা টাইলস, এক জায়গায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো পুরানো আমলের অপারেটিং টেবিল।

'অপারেটিং রুম,' মন্তব্য করলাম আমি। 'এগোও।'

বড় ঘরটির সামনে আরও দুটি ছোট ঘর। এগুলোও খালি।

'এ ঘর দুটো পরিষ্কার,' বলল আংগাস। সিঙ্কের ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিল। 'কোন ধুলো নেই।'

'ক্লিনাররা হপ্তায় একদিন এসে ধুয়ে মুছে যায়,' বললাম আমি।

'সবসময় দু'জন আসে এক সঙ্গে। একা আসতে ভয় পায়।'

মূল ঘরে ফিরে এলাম আমরা, দাঁড়ালাম দরজার সামনে। আংগাস আবার সারা ঘরে টর্চের আলো ফেলল।

'বেহুদা এলাম,' বললাম আমি।

'এ ঘরে কিছু একটা আছে,' বলল আংগাস। 'তবে এ মুহূর্তে নেই…বাইরে চলুন। বাইরে থেকে দেখব ঘরটাকে। হয়তো এমন কিছু চোখে পড়ে যাবে যা আগে দেখতে পাইনি।'

বেরিয়ে এলাম। চলে এলাম পাঁচতলায়। ঘড়ি দেখলাম। ঠিক এগারোটা বাজে। সারি সারি জানালা, প্রায় সবগুলোই অন্ধকার। ঢাকনা দেওয়া ওয়ার্ড ল্যাম্প থেকে আবছা আলোর রেখা ভেসে আসছে। রান্নাঘরে মাঝে মাঝে আলোর ঝিলিক।

পেছন ফিরলাম। তাকালাম ছয়তলার দিকে।

হলুদ আলোটা দেখা গেল আবার।

আংগাস খামচে ধরল আমার কনুই। 'চলুন, ডেরেক।'

লাফিয়ে সিঁড়ি বাইতে লাগলাম, একেকবারে দুটো করে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকলাম। ভেন্টিলেটর বা জানালায় আলো জ্বলছে এখনও। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ভিতরে কিছু একটা আছে টের পাচ্ছি দু'জনেই।

'এখন কী করব?'

ঝুঁকল আংগাস, তাকাল কী হোল দিয়ে।

'কী দেখছ?'

ধীরে ধীরে সিধে হলো আংগাস। 'গ্যাস লাইট,' অবিশ্বাস ওর কণ্ঠে। 'ডান দিকের দেয়ালে ওরা চারজন।'

'গ্যাসলাইট!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'কিন্তু এ দালানের পুরোটাই বিদ্যুতে চলে।'

'জানি,' ধীরে ধীরে বলল আংগাস। 'কিন্তু যে দৃশ্য আমি দেখেছি ওটা কতদিন আগের হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'আবার দেখো,' বললাম আমি, 'অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছ? আর কাউকে দেখা যাচ্ছে?'

ঝুঁকে দেখছে আংগাস। 'না, আগের দৃশ্যটাই।' বিরতি। 'ওদেরকে দেখে ভিক্টোরিয়ান যুগের মনে হচ্ছে।'

'হতে পারে। ১৮৭১ সালের, বাজি ধরতে পারি।'

'মর্টন?'

'তা ছাড়া আর কে?'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। 'গোল্লায় যাক সব।' বললাম আমি। 'ভিতরে যাব আমি। চাবিটা দাও।'

তালায় চাবি ঢোকালাম।

সাথে সাথে ম্লান হয়ে এল আলো, নিভে গেল।

দরজা খুললাম। লোকগুলো যেখানে ছিল টর্চের আলো ফেললাম সেদিকে। কেউ নেই।

তবে এবার কারও উপস্থিতি টের পেলাম আমরা। বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা মারছে কেউ, বের করে দিতে চাইছে ঘর থেকে।

নিশ্চয় মর্টন।

পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম। যেন অশুভ, জীবন্ত কিছু, সাইকিক একটা শক্তি, চিৎকার করে বলছিল—বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও!

'বাকি ঘরগুলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আংগাস।

'ওখানে কিছু নেই।'

'তবুও চলুন।'

আগের মতই খালি এবং নগ্ন লাগল ঘর দুটো।

ঝড়ের বেগে ঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছি, এক নার্স, হাতে এক্স-রে প্লেট নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, আমাদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপনারা আবার ও ঘরে ঢুকেছিলেন?' ব্যঙ্গ করল সে। 'ও ঘরে কি যাদু আছে?'

আমরা জবাব দিলাম না।

আংগাসকে বিধ্বস্ত লাগছে; আমাকেও নিশ্চয় ওর চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে না।

'ঘরটা মোটেই সুবিধের নয়,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ,' সায় দিল আংগাস শ্রান্ত ভঙ্গিতে। 'আপনার ধারণা ওটা মর্টন?'

'তা ছাড়া আর কে?'

একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। এ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না আমি। 'ও ঘরে শুধু মাঝে মাঝে আলো জ্বলতে দেখা যায় কেন?'

'মাঝে মাঝে উনি অপারেশন করেন।'

আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালাম। 'মর্টন এখন কী করছেন বলে তোমার ধারণা?'

'এটা আমার অনুমান মাত্র,' বিব্রত দেখাল আংগাসকে।

'আমার ধারণা অতীতের কোনও ঘটনা ওই ঘরে রিপিট হয়ে চলেছে।'

'আমরা এ জায়গাটাকে এড়িয়ে চলছি কেন? কিছু করছি না কেন?'

'কী করব?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে বললাম। 'ধরো…এক্সরসিজম? অ্যাংলিকান আর ক্যাথলিকরা ভূত তাড়ায় না?'

'জানি না ঠিক,' অনিশ্চিত গলা আংগাসের। 'তবে কাজটা বোধহয় সম্ভব। এখনও…' থেমে গেল সে।

'কী?'

'ব্যাপারটা নিয়ে চুপ থাকাই ভাল,' ধীরে ধীরে বলল আংগাস।

'আমরা জানি ওখানে কী আছে। অন্যরা…নার্স কী বলে গেল শুনলেনই তো। ওদের ধারণা আমরা পাগল।'

'এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার,' বললাম আমি।

'এই ভূতগুলো আসলে কী করছে? আমরা কিছু একটার স্পর্শ পেয়েছি, শব্দ শুনেছি। কিন্তু ওরা কী করছে দেখিনি।'

'তা বটে,' মাথা দোলাল আংগাস সতর্ক ভঙ্গিতে।

'আমি দেখব ওরা কী করছে,' বললাম আমি। 'শুক্রবার আমার ডিউটি নেই। শুক্রবার রাতটা আমি কাটাব ও ঘরে। তোমার টর্চ আর আমার লাঠি নিয়ে নিরাপদেই থাকব আমি। অন্য কেউ কোনরকম ফাজলামির চেষ্টা করলে,' মুঠো করলাম হাত, 'তার কপালে খারাবি আছে?'

'আগামী হপ্তা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এক সঙ্গে কাজটা করতে পারব। পরের

হপ্তায় আমারও ডিউটি অফ।'

মাথা নাড়লাম। 'না, যা করার এখনই করব।' বিরতি দিলাম। 'একটা কথা, আংগাস।'

'বলুন?'

'তুমি কিন্তু চোখ-কান খোলা রাখবে।'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না। স্রেফ একটা আওয়াজ দেবেন, সাথে সাথে হাজির হয়ে যাব।'

আংগাস-এর কাহিনী…

পরিকল্পনা ঠিকঠাকই ছিল।

ডেরেক মর্টনের ঘরে থাকবেন, আমি করিডরে মাঝে মাঝেই হাঁটাহাঁটি করব।

তবে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ভুলে গেছিলাম হাসপাতালে আকস্মিক অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

এক হেমোফেলিয়াক রোগী ভর্তি হলো আমাদের ওয়ার্ডে, রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেল তার। আমি ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য প্রস্তুতি নিলাম, তার শিরায় সুঁই ঢুকিয়ে দিলাম। বলা উচিত চেষ্টা করলাম।

পরপর ছয়বার চেষ্টা চালালাম। ঘামে ভিজে গোসল হয়ে গেছি। কিন্তু শিরায় ঢুকল না সুঁই। রোগীর শিরা নিশ্চল, কোন মতেই গাঁথা যাচ্ছে না সুঁই।

শেষে ঠিক করলাম পায়ের শিরায় সুঁই দেব। নার্সকে ট্রে রেডি করতে বলে S.H.O- কে ফোন করলাম। আসতে বললাম তাকে।

সিনিয়র হাউজম্যান হাজির হলেন।

'কী হয়েছে, আংগাস?'

বললাম তাঁকে।

'হুমম,' বললেন তিনি। 'অবস্থা সুবিধের ঠেকছে না। আবার চেষ্টা করে দেখো।'

সুঁই হাতে নিয়ে ঝুঁকলাম আমি, এবার পটাং করে শিরার মধ্যে ঢুকে গেল।

খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম। 'এবার হয়েছে…'

আর ঠিক তখন শুরু হলো ওটা।

তীব্র আতঙ্কের চিৎকার ভেসে এল, একের পর এক আসতেই লাগল।

'চিৎকার কীসের?' ভীত গলায় বলল নার্স। 'আসছে কোত্থেকে?'

আমি ততক্ষণে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করেছি।

দরজার উপরে ভেন্টিলেটরে আলো জ্বলছে। চিৎকার বদলে ওটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজে পরিণত হয়েছে, যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে, শব্দের মাত্রাও আগের চেয়ে ক্ষীণ।

'ডেরেক!' চেঁচালাম আমি। 'ডেরেক!'

কোনও জবাব নেই।

দরজা বন্ধ। আমি কয়েক কদম পিছিয়ে এলাম। তারপর ছুটে গেলাম দরজার দিকে। প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম, দরজাটা বোধহয় লোহা কাঠের তৈরি: তালায় পাগলের মত লাথি মারতে লাগলাম। যদিও জানি কোনও লাভ হবে না।

পায়ের শব্দ পেলাম। করিডর ধরে ছুটে আসছে নার্স। আরও পায়ের আওয়াজ, কণ্ঠ, আরও কয়েকজন নার্স এবং পোর্টার হাজির হলো।

সবার আগে রাতের নার্সটি পৌঁছুল আমার কাছে।

'কুড়াল, ডাক্তার। কুড়াল দিয়ে চেষ্টা করুন।'

চারদিকে তাকালাম। দেয়ালে, কাঁচের কেসে রাখা কুড়ালটা চোখে পড়ল। এক ঘুসিতে ভেঙে ফেললাম কাঁচ। বের করে আনলাম কুড়ালটা।

পাগলের মত ছুটে গেলাম দরজার দিকে, হাঁপাচ্ছি, কাঁপছি থরথর করে, গালির তুবড়ি ছুটছে মুখ দিয়ে, হাতের উপরের প্যানেলে সজোরে নামিয়ে আনলাম অস্ত্রটা। কোপাতে লাগলাম।

অবশেষে ভেঙে গেল তালা।

হাত বাড়িয়ে ভিতর থেকে চাবি ঘোরালাম, ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়লাম ঘরে।

যা ভেবেছিলাম তারচেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

ওখানে আছে ওরা। একটা টেবিলে একটা শরীরকে ঘিরে। পরনে প্রায় দেড়শো বছর আগের পুরানো পোশাক, নার্সরা গায়ে চড়িয়েছে কালো ড্রেস, মাথায় সাদা টুপি, দুই লোকের গায়ে অপারেটিং গাউন।

একজন ডেরেকের মুখের উপর চেপে ধরেছে একটি পুরানো Schimmelbusch মাস্ক, গায়ে বাদামী একটি বোতল থেকে কী একটা তরল ঢালছে ওটার উপরে। ক্লোরোফর্মের গন্ধে বাতাস ভারী।

মর্টন ঝুঁকে আছেন টেবিলের উপর, হাতে স্ক্যালপেল। কোনদিকেই খেয়াল ছিল না ওদের, দরজা খুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত।

দলটার সামনে আমি। অন্যেরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি।

মর্টন শিরদাঁড়া টানটান করলেন, চেহারায় প্রচণ্ড রাগ। হাতের ছুরিটা বিদ্যুৎগতিতে নেমে এল নীচে।

এরপর ভৌতিক অবয়বগুলো আবছা হয়ে যেতে লাগল।

কীভাবে ব্যাখ্যা করব আমি এ ঘটনা? আপনি ইলেকট্রিক আগুনের সুইচ বন্ধ করলেন, আস্তে আস্তে নিভে এল সব; কিন্তু তারপরও কয়েক সেকেন্ড একটা শব্দ শুনতে পাবেন আপনি।

এরা অনেকটা সেরকম—এই আত্মা, প্রেত বা ভূত যা-ই বলুন—ছায়ামূর্তির মত, আবছা ও ম্লান, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা, তারপর আর কিছুই রইল না ঘরে।

শুধু প্রাচীন আমলের অপারেটিং টেবিল আর তার উপরের শরীরটা ছাড়া, এবং কাটা গলা থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্ত।

অনীশ দাস অপু

জঙ্গলে অমঙ্গলের ছায়া

শোঁ শোঁ বাতাস কেটে এগিয়ে চলছে 'হিরো স্নিক'। ফোরস্ট্রোক ইঞ্জিন বলে বেশ সুবিধা মত লং রোডে ড্রাইভ করা যাচ্ছে। রাত বাড়ার আগেই আশা করছি ধনবাড়ি পৌঁছে যেতে পারব। মোটামুটি মাঝরাতে পৌঁছে নাদিয়া-রণিকে চমকে দেবার ইচ্ছা আমার। 'আর্কির চিপা' আড্ডাতে তাদের আমন্ত্রণ আসলেই ছিল আন্তরিক।

'আর্কির চিপা' হচ্ছে আমাদের বুয়েট লাইফের একটা কমন আড্ডা। আর্কিটেকচার বিল্ডিং-এর পিছনে গাছে ঢাকা নির্জন জায়গাটা আড্ডা দেয়ার জন্যে ছিল আদর্শ। থিউরী অভ মেশিন আর স্ট্যাবিলিটি ক্যালকুলেশনের জটিল চাপ্টারগুলো সলভ করার ফাঁকে ফাঁকে এসে সবাই জমায়েত হতাম 'আর্কির চিপা'তে। আড্ডাটা বেশির ভাগ সময়ই জমে উঠত রণি আর নাদিয়ার ডায়নামিক স্ট্যাবিলিটি ক্যালকুলেশনের জটিল মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে। বইয়ের পাগল শিবলীও নতুন নতুন কাহিনী বলে কিংবা বানিয়ে জমিয়ে রাখত আড্ডাটা।

আড্ডা আর রণি-নাদিয়ার জমপেস প্রেম দেখতে দেখতেই কেটে গেল বুয়েট লাইফটা। নাদিয়া পড়ত সিভিল ডিপার্টমেন্টে আর রণি আমাদের সাথে মেকানিক্যালে। রেজাল্ট অবশ্য নাদিয়ারই ভাল হলো। এতে খুব একটা অবাক হলাম না, কারণ রণিকে দেখতাম পরীক্ষার আগে হিট ট্রান্সফারের অঙ্ক করতে গিয়ে নাদিয়াকে হার্ট ট্রান্সফারের থিসিস লেখাত। সবাই অবাক হলাম যখন দেখলাম আমরা বুয়েট থেকে বের হয়ে যখন চাকরির ধান্দায় ঘুরছি ঠিক তখন নাদিয়া-রণি ধাম্ করে বিয়ে করে হানিমুনের প্ল্যান করছে।

পাস করার পর বছর খানেক কেটে গেল। আবার সবাই একসাথে হলাম আর্কির চিপায় অনেক দিন পরে। প্রধান আকর্ষণ রণি-নাদিয়া। অবশ্য এখন ওরা স্বামী-স্ত্রী। খুব দুষ্টামি করলাম আমরা। নাদিয়াকে বললাম, 'ভাবী, চকবার খাওয়ান।' চকবারের পালা শেষ হলে আবার রণিকে বলছি, 'দুলাভাই, ঠাণ্ডা খাওয়ান।'

হাবীব বলল, 'কীরে নাদিয়া, রণির সাথে কেমন জমাচ্ছিস?'

ওর ভঙ্গিতে বিপজ্জনক কিছু টের পেয়ে নাদিয়া থামিয়ে দিল। 'না, তোদের আর এগুতে দেয়া যাবে না, তোদের কথার কোন স্টেশন নেই। কখন কী বলে বসবি।'

রণি বলল, 'আয় না দোস্ত, তোরা একবার ধনবাড়িতে আমাদের সংসার দেখে যাবি। সুন্দর একটা রাজবাড়ি আছে ওখানে। পিকনিক করা যাবে।' শিবলীর দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'তুই তো বেশ থ্রিলার ট্রিলার পড়িস। ঘুরে আয়, বেশ থ্রিল

পাবি। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা সুন্দর বাড়ি আছে, পুকুরওয়ালা বিশাল বাড়ি। তোর "মাসুদ রানা" সিরিজ রাইটারের এক রিলেটিভের বাসা। গেলে পরিচয় করিয়ে দেব।'

আরও অনেক কিছুর লোভ দেখাল তারা। আজ টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে একটা অফিশিয়াল কাজে এসেছিলাম। কাজ সেরে চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো রণি-নাদিয়াকে একটু চমকে দিলে কেমন হয়! মটর সাইকেলে বেশিক্ষণ লাগবে না ধনবাড়ি যেতে। রাস্তাও মোটামুটি ভাল। একটানে গেলে রাত দশটা এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। যাত্রার ক্লান্তি দেহে। ভাবলাম গিয়েই গোসল করে ফ্রেস হয়ে জমিয়ে আড্ডা দেব। কিন্তু আমার কপাল মন্দ। তখন আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে কী ভয়ঙ্কর একটা রাত আমার সামনে। আসলে সবই ভাগ্যের লিখন। নইলে ঘাটাইল সেনানিবাস পাশ কাটিয়ে কেন আমি ধনবাড়ির রাস্তা ছেড়ে মধুপুর জঙ্গলের রাস্তা ধরব।

হঠাৎ করেই আমার বাইক যক্ষ্মা রোগীর মত কাশতে শুরু করল। ভাবলাম স্পার্কপ্লাগ কিংবা অন্য কোথায়ও ময়লা জমেছে। এটা সেটা নাড়াচাড়া শুরু করলাম। কীভাবে কী হলো জানি না, হঠাৎই ইঞ্জিন সচল হয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু সামনে এগুতেই একটা দোকান চোখে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ধনবাড়ি কত দূর। উত্তর শুনে ভীষণ হতাশ হলাম। এটা ধনবাড়ির রোড না। ধনবাড়ি ডানদিকে, আমি বামে চলে এসেছি। ভাবলাম বনের ভিতর দিয়ে যে রাস্তা আছে সেটা পার হয়ে আবার ডানের রাস্তা ধরব। আর এখানেই আমি জীবনের চরম বোকামি করলাম। বনের ভিতর দিয়ে মাইল দূয়েক এগিয়েছি, দেখলাম রাস্তা সরু হয়ে এসেছে। সেই সরু রাস্তা দিয়ে কতক্ষণ চলেছি ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হচ্ছিল অনন্ত কাল চলছি। আসল দুর্ভোগ শুরু হলো যখন বাইকটা কয়েকবার ঝাঁকি খেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম, কোন কাজ হলো না। চারদিকে কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। কোন আলোও দেখা যাচ্ছে না।

আমি খুব একটা ভীতু নই। তবু কীসের এক অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল। কীসের এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইক ছেড়ে নড়তে চাচ্ছি না। কিন্তু অদৃশ্য হাতছানির কাছে যেন আমি অসহায়। না চাইলেও এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে একটা টিলা।

টিলাটা পাশ কাটিয়ে ওপাশে যেতেই পরম স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। আমি যার প্রত্যাশা করছিলাম ঠিক সেই জিনিসটাই পেয়ে গেলাম। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে চুইয়ে চুইয়ে। আলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। অজানা আশঙ্কাটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। সামনে এগিয়ে চোখে পড়ল আলোর উৎস।

একটা পুরানো ধাঁচের বাড়ি। দেয়ালের কাজ দেখে বোঝা গেল এক সময় এর খুব জৌলুস ছিল।

মোটামুটি বেশ বড়ই বাড়িটা। যদিও অস্বাভাবিক তেমন কিছু চোখে পড়ল না, তবে কেমন একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব। পরে খেয়াল করলাম বাড়িসহ

আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলটাতে চাঁদের আলো পড়ছে না। এক খণ্ড মেঘ মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দরজার কড়া নাড়ালাম। শক্ত মজবুত লোহা কাঠের দরজা। ভিতর থেকে কোন সাড়া পেলাম না। এবার ডাকলাম শব্দ করে, 'ভিতরে কেউ আছেন?' কোন সাড়া নেই। ভাল করে খেয়াল করলাম দালানটা। শ্যাওলা পড়ে গেছে। আলো আসছিল একটা জানালা দিয়ে।

ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। ভাবছি প্রচণ্ড জোরে আঘাত করব দরজায়। হয়তো ভিতরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় হালকা একটা আওয়াজ পেলাম। পা ঘসটানোর শব্দ। পরক্ষণেই দরজার খিল খোলার শব্দ। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা।

যাকে সামনে দেখলাম তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। মোমবাতি হাতে একজন আদিবাসী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দরী। চোখগুলো বড় বড়। মনে হচ্ছে সাজগোজ করে মহিলা কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল। ঘুমের রেশ মাত্র নেই তার চোখে। আমাকে দেখে মৃদু হাসল। আমন্ত্রণের হাসি।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভুল দেখছি না তো! মহিলার বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। মহিলা না বলে তরুণী বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। পরনে তার খুব স্বল্পবসন। দুই প্রস্থ কাপড় দিয়ে ঢেকেছে উপর এবং নীচের অংশ। মাঝখানে নাভী এবং তার চারপাশের বিপজ্জনক কিছু অংশ অনাবৃত। কোন মতে নিজেকে সংবরণ করে আমার সমস্যার কথা তাকে বোঝাতে শুরু করলাম। তরুণী আমার কথা বুঝল কিনা বোঝা গেল না। স্মিত হাসল কেবল। ইঙ্গিতে আমাকে ভিতরে ঢুকতে বলল। আমি ঢুকতে সে আমাকে গা ঘেঁষে পাশ কাটাল দরজা বন্ধ করার জন্যে। হালকা একটা গন্ধ পেলাম। কোন বিদেশী সেন্টের গন্ধ নয়। বন্য মাদকতাপূর্ণ গন্ধ। একটা নরম দুর্লভ স্পর্শে পুলকিত হলাম। ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল তরুণী।

ছোট টেবিলটার উপর রাখা বাতিটি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল মেয়েটি। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। ভিতরের রুমে তেমন কোন আসবাব নেই। কেবল একটা সিঙ্গেল খাট। তার উপর ছোটখাট এক বৃদ্ধ মহিলা শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে কোন কথা বললেন না। তবে আমাকে দেখে যে খুশি হয়েছেন বোঝা গেল তাঁর চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখে। বৃদ্ধার সাথে কী যেন কথা বলল আমার পথ প্রদর্শক মেয়েটি। উপজাতীয় ভাষা। আমি কিছুই বুঝলাম না।

বৃদ্ধা আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। বিছানার কাছে গিয়ে একটা উৎকট দুর্গন্ধ টের পেলাম। বৃদ্ধা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর ইশারায় মেয়েটির সঙ্গে যেতে বললেন।

মেয়েটি আমাকে খুব আন্তরিকভাবে দু'তলার একটা ঘরে নিয়ে এল। বাড়িটি আসলে দোতলা। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। মাথার উপরে বাড়ির ছাদ। মেয়েটির দিকে তাকালাম। সে চোখের তারায় ঝিলিক তুলে স্মিত হাসল। তারপর ইশারায়

এখানে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে কি আমাকে কোন ইঙ্গিত করে গেল?

ঘুরে ঘুরে দেখলাম ঘরটি। তেমন আসবাবপত্র নেই। একটা সেগুন কাঠের পুরানো দিনের খাট। অনেক ডিজাইন করা খাটটি। দেয়াল বরাবর দুটি চেয়ার। এককোণে খুব ভারি একটা টেবিল। টেবিলের উপর ধাতব বাতিটা। মেয়েটিই এটা বহন করে নিয়ে এসেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল দোতলায় ওঠার প্যাসেজটা বাতি ছাড়া খুব বিপজ্জনক। মেয়েটি অন্ধকারে নামবে কী করে? একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে বাতিটি নিয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করার ইচ্ছা হলো। আর তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করলাম।

বাতিটি সম্ভবত ব্রোঞ্জের তৈরি। হাতে তুলে নিতে গিয়ে অবাক হই ভীষণ। প্রচণ্ড ভারি বাতিটি। দু'হাতে তুলতে চেষ্টা করি। অসম্ভব, এক ইঞ্চিও নড়ানো গেল না। অথচ এটাই এতক্ষণ মেয়েটি একহাতে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়িয়েছে। খেয়াল করলাম ভাল করে, টেবিলের সাথে এটা আটকানো কিনা? না তো!

ভাবলাম মেয়েটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব রহস্যটা কী। দরজা টান দিয়ে দেখি তা ওপাশ থেকে বন্ধ।

ঘরের অন্য পাশে আরেকটি দরজা। সেটিও বন্ধ, ভাবলাম, মেয়েটি একা। আমি তার একাকিত্বের সুযোগ নিতে পারি ভেবে হয়তো দরজা আটকিয়ে দিয়েছে।

যাক। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বেশ। ঘুমানো দরকার। মৃদু আলোতে কাপড় ছাড়লাম। শুতে যাবার আগে ভীষণ ইচ্ছা হলো গোসল করার। ঘরের অপর দরজাটা হয়তো গোসলখানা। দেখি চেষ্টা করে খোলা যায় কিনা। আমার কাছে অফিসের একগোছা চাবি আছে। বাসারও কিছু চাবি আছে। সেগুলো দিয়ে চেষ্টা করলাম। এবং দরজা খুলে গেল।

খুব স্বস্তি পেলাম। কারণ এটা গোসলখানাই। বাতির খোঁজ করলাম। কারণ ধাতব বাতিটি নড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। অনেক খুঁজেও আলোর ব্যবস্থা হলো না। অগত্যা অন্ধকারেই গোসলের জন্যে তৈরি হলাম।

কল খুলে অবাক হলাম। শোবার ঘর থেকে যে হালকা আলো আসছে তা থেকে বুঝলাম এখানকার পানিতে আয়রন খুব বেশি। লাল পানি। অবশ্য কল অব্যবহারে মরচে পড়েও এ রঙ হতে পারে।

বিদেশী কায়দায় একটা বাথটাবও আছে এখানে। যদিও সেকেলে ধরনের। প্যান্ট খুলে টাবে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার দম আটকে এল। হায় আল্লাহ, এ কী? টাবটার চারদিক আর তলাটা কেমন পিচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এ রক্ত। হয়তো মানুষের। লাফিয়ে উঠে এলাম। মুহূর্তের জন্যে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। হুঁশ হলে খেয়াল করলাম আমার সারা শরীর রক্তে লাল হয়ে আছে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হবে। যে করেই হোক আলোটা আনতে হবে।

শোবার ঘরে এসে বাতিটা সরানোর কায়দা খুঁজতে লাগলাম। কিছুতেই আটকানো নেই বাতিটা। মোটামুটি একটা পানি খাওয়ার জগের মত বড় বাতিটা।

অনেক চেষ্টা করে বাতির ওজনকে পরাস্ত করলাম। টেনে টুনে নিয়ে এলাম গোসলখানায়। যা ভেবেছিলাম, তাই। রক্ত আর রক্ত। মানুষেরই রক্ত। কারণ এক কোণে পড়ে আছে তারই নমুনা–দুটি লাশ। দুজনেই সম্ভবত উপজাতীয়। কিছুটা বিকৃত লাশ দুটি। রক্ত বের করার জন্যে বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমার চিন্তাশক্তি গুলিয়ে গেছে। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কিছুটা ধাতস্থ হলে প্রথমেই তোয়ালে দিয়ে মুছে নিলাম রক্ত। শোবার ঘরে আসতেই মনে হলো এতক্ষণ যা দেখেছি সব স্বপ্ন। কিন্তু তোয়ালেতে রক্তের ছোপ, তাকে অস্বীকার করি কী করে? তারমানে এ জ্বলজ্যান্ত সত্য। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সত্য।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। তারপর আস্তে ধীরে কাপড় পরে নিলাম। আশেপাশেই আছে মূর্তিমান আতঙ্ক। কোন মতেই আর বসে থাকা যায় না। লাশের যা অবস্থা তাতে স্পষ্ট যে শরীরের সমস্ত রক্ত নিংড়ে নেয়া হয়েছে। এতক্ষণ স্পষ্ট হলো বাড়ির বাসিন্দাদের আচরণ। মাঝরাতে একা এক রমণী কী করে একজন অচেনা সমর্থ পুরুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘরে তোলে! বৃদ্ধার চোখ আমাকে দেখে কেন খুশির ঝিলিক খেলেছিল! হয়তো বৃদ্ধার কিংবা মেয়েটির জন্যে রক্ত কোন অপরিহার্য আহার্য। হয়তো আমিই তাদের পরবর্তী শিকার। শিউরে উঠলাম। দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে। এতক্ষণ এটার দিকে নজরই পড়েনি আমার। কিন্তু হতাশ হলাম–শক্ত পাল্লায় পেরেক ঠোকা। খোলা যাবে হয়তো, কিন্তু প্রচুর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। দরজার কাছে দৌড়ে গেলাম–বাইরে থেকে বন্ধ। অর্থাৎ আমি বন্দী।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় পায়ের আওয়াজ। আওয়াজটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে। দরজার সামনে এসে থেমে গেল।

মহা আতঙ্ক ভর করেছে আমার মধ্যে। বুকের ঢিব ঢিব শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কপালের শিরা লাফাচ্ছে।

খট করে দরজাটা খুলে গেল। সামলে নিলাম নিজেকে।

দরজায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। বুকের কাপড়ের গিঁট খুলতে ব্যস্ত হলো। আমি সাহস করে বলে উঠলাম, 'প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে আমার, এক ঘণ্টা ঘুমুতে পারি কি?' জোর করে হাসি ফোটালাম মুখে।

সে আমার কথা কী বুঝল জানি না। স্মিত একটু হাসল। তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল। যাওয়ার আগে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলল না।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পরই নিজেকে ধিক্কার দিলাম। কেন যে ওকে কাবু করে পালালাম না। আসলে তাকে দেখেই আমার শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, বাতিটা যে একহাতে নিয়ে এসেছে তার নিশ্চয়ই শক্তি প্রচুর! হয়তো পারতাম না।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ ক্রমেই পিছিয়ে গেল। পালানোর উপায় খুঁজতে লাগলাম। চারপাশটা ভাল করে দেখা দরকার। বাতিটা রয়েছে গোসলখানার দরজার কাছে। আবার অনেক কষ্টে সেটা বয়ে আনলাম। চারপাশটা ভাল করে দেখার জন্যে ভারি বাতিটা খাটের উপর রাখলাম। খাটটা কি কিছুটা ডেবে গেল বাতিটার ভারে?

ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খেয়াল করিনি এতক্ষণ, খাটের উপরের ছাদটা থেকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সুচালো তিনটি ধাতব রডের মত ঝুলে ছিল। বাতিটার ভারে সম্ভবত খাটের সাথে পাতা কোন ফাঁদের মুখ খুলে গিয়েছিল। ধাতব বস্তু তিনটি প্রবল বেগে নেমে এল। সেই সাথে পাশের দেয়াল থেকেও দুটি ধাতব শলাকা তীর বেগে বেরিয়ে এল। বুঝলাম খাটের মধ্যে বসলে কিংবা শুলে একটা না একটা শলাকা আমার গায়ে লাগতই। নিশ্চয়ই বিষ মাখানো?

নিতান্ত কপালগুণেই বেঁচে গেলাম। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হতাশ ভাবে এদিক সেদিক তাকাচ্ছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। হয়তো এটা আমার উত্তেজিত স্নায়ুর জন্যে শুনছি। কিন্তু পরক্ষণে দরজা খোলার শব্দ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এক লাথিতে বাতিটা খাট থেকে ফেলে দিলাম। ভয় পেলে চলবে না। সাহস করে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখতে লাগলাম কী ঘটে। বাতিটা পড়ে গেলেও, নেভেনি। চাদরে ঝুলে থাকা প্রান্তে আগুন ধরে গেছে। প্রথমে ঢুকল মেয়েটা, কালো একটা কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢাকা। মেয়েটার পিছনে বৃদ্ধা। তারও পোশাক একই রকম কালো। দ্রুত তারা এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। মেয়েটার হাতে একটা বিশাল রামদা। খাটের উপর আমার দেহটা না পেয়ে দু'জনেই আমাকে এদিক সেদিক খোঁজা শুরু করল। বৃদ্ধার হাতের মোমবাতির আলোতে দেখলাম মেয়েটিকে এখন আর কমনীয় সুন্দরী লাগছে না, বরং ভয়ঙ্কর হিংস্র লাগছে।

আমি মরিয়া হয়ে এদিক সেদিক পালানোর উপায় খুঁজতে লাগলাম। কমোডের উপর সিস্টার্নের পাশ দিয়ে একটা স্কাইলাইট দিয়ে তারার আলো দেখা যাচ্ছে। সময় অত্যন্ত অল্প। ঝট করে কমোডের উপর উঠে সিস্টার্নটা ধরে তার উপরে উঠে পড়লাম। আর ঠিক তখনই বাথরুমের দরজা খুলে গেল।

আমার ঠিক নীচে এসে মেয়েটি রামদা উঁচিয়ে বীভৎস চিৎকার করছে। তার কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মেয়েটা বাংলায় বলে উঠল, 'নাম। রক্তের মানুষ রক্ত দিয়া যা।'

ভয়ে আমার শরীরের রোম খাড়া হয়ে গেল। কনুই-এর গুঁতোতে স্কাইলাইটের কাঁচের জানালা ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যা থাকে কপালে। সাঁই করে বাতাস কেটে পড়লাম নরম কীসের উপর। এটা একতলার ছাদ। আতঙ্কের উপর আতঙ্ক। ছাদের উপর বিছিয়ে আছে একরাশ গলিত মৃতদেহ। তারই একটার উপর পড়েছি আমি। লাশগুলোর কোনটা পুরানো, কোনটা সদ্য মৃত। সম্ভবত সবাই ছিল আমারই মত। একরাতের অতিথি।

ছাদের চারপাশের রেলিংটা বেশ উঁচু। চেষ্টা করতে লাগলাম সেটা টপকাবার। এরমধ্যে দেখি স্কাইলাইট দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে আসছে। ছাদে মেয়েটির পা যখন স্পর্শ করল ঠিক তখনই আমি রেলিং-এর উপর শরীরটা তুলে নিতে পারলাম।

মেয়েটি প্রচণ্ড উল্লাসে রামদা দোলাতে দোলাতে আমার দিকে দৌড়ে এল। ভয়ঙ্কর একটা আঘাত অনুভব করলাম হাতে। পরক্ষণেই অনুভব করলাম নীচে পড়ে

যাচ্ছি আমি।

পড়েই উঠে দাঁড়ালাম কোন মতে। অন্ধকারে কোন দিকে দৌড়াচ্ছি বুঝতে পারলাম না। কতক্ষণ দৌড়েছি জানি না, তবে জানি জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত থামিনি।

ঘাটাইল সি.এম.এইচ-এ জ্ঞান ফিরলে রণি আর নাদিয়া জানতে চাইল সমস্ত ঘটনা। নাদিয়া আরও সুন্দর হয়েছে। অবশ্য সে আগে থেকেই সুন্দর। একবার বুয়েটে লেভেল পূর্তিতে রানী নির্বাচিত হয়েছিল সে। আমি ওদের বললাম না ভয়ঙ্কর সে কথা। বললে এটাকে ওদের কাছে 'আর্কির চিপা'-এর চাপা মনে হবে। অবশ্য পরদিন পেপারে একটা খবর পাওয়া গেল। 'মধুপুর জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড।' অনেক গাছ, সেই সাথে একটা পুরানো বাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে বিশ-পঁচিশ জন মানুষ ভস্মীভূত হয়েছে। মৃতদেহ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। কেবল কিছু ধাতব তৈজসপত্র ছাড়া কিছুই সনাক্ত করার উপায় নেই। আশ্চর্য রকম ভারি কিছু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি ব্রোঞ্জের বাতি পাওয়া গেছে, যার ওজন প্রায় পঞ্চাশ কেজি।

(বিদেশী কাহিনীর ভাবালম্বনে)

শাহারিয়ার মোঃ শোয়েব

***